মনুষ্যত্ব বিকাশে ধর্ম

কল্যাণমিত্র শ্রীসত্যনারায়ণ গোয়েঙ্কা

অনুবাদক
ডঃ সুকোমল চৌধুরী

বাংলাদেশে মুদ্রণে উদ্যোক্তা
কাজল প্রিয় বড়ুয়া
ও
সুলেখা বড়ুয়া (রিনি)
৫৪৬ শাহীনবাগ, তেজগাঁও, ঢাকা

MANUSYATVA VIKĀŚE DHARMA

BY

S. N. GOENKA

TRANSLATED BY

DR. SUKOMAL CHOWDHURY

প্রথম বাংলাদেশ সংস্করণঃ
২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৮
৮ই ফাল্গুন, ১৩৯৪

পরিবেশনায়
ন্যাশনাল বুদ্ধিষ্ট ইয়ুথ ফেডারেশন-
বাংলাদেশ ।
৫-এ মগবাজার এপার্টমেন্ট
১২৬, বড় মগবাজার, ঢাকা
ফোন : ৮৩৬৮৮৭

মুদ্রণেঃ
ব্র্যাক প্রিন্টার্স
৬৬ মহাখালী বা/এ
ঢাকা, বাংলাদেশ

মূল্যঃ পঁচিশ টাকা মাত্র

Printed for free distribution by
The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation
11F., 55 Hang Chow South Road Sec 1, Taipei, Taiwan, R.O.C.
Tel: 886-2-23951198 , Fax: 886-2-23913415
Email: overseas@budaedu.org
Website:http://www.budaedu.org
This book is strictly for free distribution, it is not for sale.
এই বই সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিতরণের জন্য, বিক্রয়ের জন্য নহে।

প্রাক্-কথন

১৩৮৭ বঙ্গাব্দের (১৯৮০ খৃঃ অঃ) বুদ্ধ পূর্ণিমা আসন্ন। শ্রীলংকা পরিভ্রমণ শেষে ভারত হয়ে দেশে ফিরলেন ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ ভিক্খু। সাথে আনলেন কয়েকটি অতি প্রয়োজনীয় বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ। এই গ্রন্থরাজি হতে আশীর্ব্বাদ স্বরূপ লাভ করেছিলাম ডঃ সুকোমল চৌধুরী অনূদিত "মনুষ্যত্ব বিকাশে ধর্ম" শীর্ষক স্বল্প পরিসরের একটি পুস্তক।

বইটি প্রথমবার পড়েই আমার কাছে অত্যন্ত যুগোপযোগী ও বিজ্ঞানসম্মত বলে মনে হয়েছে। তদুপরি ভাষার সারল্যের কারণে বাংলা ভাষাভাষী আবাল-বৃদ্ধবনিতার নিকটই বইটি গ্রহণযোগ্য ও হৃদয়গ্রাহী হবে বলে আমার একটি ধারণা জন্মেছিল। পরবর্তীতে আমার পরিচিত অনেককেই বইটি পড়তে দিলে বাংলাদেশে এর পুনর্মুদ্রণের প্রস্তাবে প্রত্যেকেই সাহায্য-সহযোগিতার আশ্বাস দেন। বলা বাহুল্য যে, এর পূর্ব থেকেই ধর্মের উন্নতিকল্পে কিছু করার উদ্দেশ্য নিয়ে ব্যক্তিগত পর্যায়ে আমি কিছু কিছু অর্থ সংগ্রহ করতে শুরু করেছিলাম। অতএব, সংগৃহীত অর্থ সহযোগে প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত অর্থ সংস্থানের মাধ্যমে বইটি প্রকাশের মনস্থির করে ফেললাম।

এরও বেশ কিছুদিন পরে বাংলাদেশে বইটি প্রকাশের অনুমতি চেয়ে কলিকাতাস্থ বিদর্শন শিক্ষাকেন্দ্রের সভাপতি ভদন্ত প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাস্থবিরের নিকট পত্র লিখি। কিন্তু, পত্র অপ্রাপ্তি অথবা অন্য যে-কোন কারণেই হোক বইটি বাংলাদেশে প্রকাশের জন্য তাঁদের কাছ থেকে লিখিত কোন অনুমতি পাওয়া গেল না। তবে একান্ত আনন্দের বিষয় এই যে, ভারতীয় সংঘরাজ মহাসভার মহামান্য সংঘরাজ পূজ্যস্পদ ধর্মাধার মহাস্থবির মহোদয় বিগত ১৯·২·৮৮ তারিখে ঢাকা ভ্রমণকালে এই পুস্তকটি বাংলাদেশে পুনরায় মুদ্রিত হবে জেনে সন্তুষ্ট হয়ে একটি শুভেচ্ছাবাণী প্রদান করেন।

বইটি মুদ্রণের সময়ে বেতাগী গ্রামের স্নেহাস্পদ শোভন ও মুকুলের আন্তরিক সহযোগিতা না পেলে এটির প্রকাশ আরো বিলম্বিত হোত নিঃসন্দেহে। মুদ্রণের ক্ষেত্রে ব্র্যাক প্রিন্টার্স প্রশংসিতেরও প্রশংসিত। অতএব, সুন্দর, ঝক্‌ঝকে ও প্রায় নির্ভুল মুদ্রণের তালিকায় আমাদের বইটিও এর পরবর্তী সংযোজন। যাদের আর্থিক সাহায্যে বইটি প্রকাশ করা সম্ভব হলো এর একটি তালিকা দয়া করে পরিশিষ্টে দেখা যেতে পারে।

বইটি সাধারণ পাঠক সমাজে সমাদৃত হলে আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

১৩ই জুন, ১৯৮৮
ঢাকা, বাংলাদেশ।

(কাজল প্রিয় বড়ুয়া)

নিবেদন

বছর তিনেক আগে একদিন সৌভাগ্যক্রম কল্যাণমিত্র শ্রী গোয়েঙ্কাজীর সাক্ষাত পেয়ে গেলাম দমদম বিমান বন্দরে। আমার সঙ্গে ছিলেন শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাস্থবির। পরিচয় হ'ল, কিছুক্ষণ বিভিন্ন বিষয়ে আলাপও হল। প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ গোয়েঙ্কাজী আমাকে উপহার দিলেন তাঁর সারাজীবনের অভিজ্ঞতা-প্রসূত গ্রন্থরাজির একখানি গ্রন্থ **'ধর্ম—জীবন জীনে কী কলা'**। হিন্দীতে লেখা। গ্রন্থখানির উপযোগিতা সম্বন্ধে ইতিপূর্বে আমি কিছুটা শুনেছিলাম। তাই স্বয়ং লেখকের হাত থেকে সেদিন তা পেয়ে ধন্য হয়েছিলাম। একটি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিদর্শনাচার্যের সঙ্গে সেই প্রথম সাক্ষাত আমার জীবনে সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা। বহুদিন থেকে তাঁর কথা শুনে আসছিলাম এবং মানসপটে তাঁর একটা ভাবমূর্তি অঙ্কিত হয়ে ছিল। সাক্ষাতে সেই ভাবমূর্তির অপূর্ব সাদৃশ্য দেখে আমি বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গিয়েছিলাম। যেন আমার সামনে বসে আছেন একজন দেবদূত—সর্বাঙ্গে তাঁর অপরিসীম প্রশান্তির ছাপ। শান্ত, সৌম্য, সুদর্শন। জিতেন্দ্রিয়, শান্তদৃষ্টি, শান্তপ্রকৃতি। অনন্ত মৈত্রী, প্রেম করুণার প্রতিমূর্তি— যাঁকে দেখে শ্রদ্ধায় আপনা থেকেই মাথা অবনত হয়ে যায়। * * * ঘন্টাখানেক পরে তিনি যখন বোম্বাইগামী প্লেন ধরার জন্য উঠে পড়লেন, এক ফাঁকে সভয়ে অনুমতি চাইলাম, যদি সম্ভব হয় তাঁর গ্রন্থখানির বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করবো বহুজন-হিতায়, বহুজন-সুখায়। তিনি সানন্দে আমাকে অনুমতি দিয়েছিলেন এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেছিলেন— 'ইচ্ছিতং পত্থিতং তুয্হং খিপ্পমেব সমিজ্ঝতু'— (আপনার ইচ্ছা শীঘ্রই পূর্ণ হোক)।

আজ প্রায় তিন বছর পরে আমার সেই ঈপ্সিত অনুবাদ সম্পূর্ণ হ'ল। অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, সাংসারিক শত ঝঞ্ঝাটের মধ্যে ব্যস্ত থাকার ফলে অনুবাদের কাজে বেশী সময় দিতে পারিনি। তাছাড়া হিন্দী সাহিত্যে আমার জ্ঞান সীমিত। তাই বিনা দ্বিধায় বলি—পূজ্যপাদ গোয়েঙ্কাজীর গ্রন্থ অনুবাদ করতে যাওয়া আমার পক্ষে পঙ্গুর গিরি লঙ্ঘনের মত। তবুও প্রাণের আবেগে এ কাজে হাত দিয়েছি। কারণ গ্রন্থখানি পাঠ করে আমি বুঝেছি যে এর নিয়মিত পাঠ

জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলেরই অপরিহার্য—অন্তত বর্তমান 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী'তে। বাংলা ভাষাভাষী পাঠককুলও যাতে এই গ্রন্থের মর্ম অনুধাবন করতে সক্ষম হ'ন—সেজন্য আমার এই প্রয়াস। এই গ্রন্থপাঠে যদি সামান্য কয়েকজনও উপকৃত হন, তাহলে আমার এই প্রয়াস সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

"ভবতু সব্বমঙ্গলং"

কলিকাতা
বুদ্ধপূর্ণিমা, ১৩৮৭

সুকোমল চৌধুরী

প্রস্তাবনা

বিদর্শনাচার্য শ্রী সত্যনারায়ণ গোয়েঙ্কা-বিরচিত **"ধর্ম—জীবন জীনে কী কলা"** শীর্ষক গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ **"মনুষ্যত্ব বিকাশে ধর্ম"** প্রকাশিত হ'ল। হিন্দী নামটির আক্ষরিক বঙ্গানুবাদ করলে গ্রন্থখানির প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে পাঠকের মনে দ্বিধা আসতে পারে—সেজন্য বিষয়বস্তুকে ভিত্তি করে এর নাম দেওয়া হয়েছে—**"মনুষ্যত্ব বিকাশে ধর্ম"**।

আলোচ্য গ্রন্থে গ্রন্থকার তাঁর সারাজীবনের অভিজ্ঞতা পরিস্ফুট করেছেন। গ্রন্থকার ব্রহ্মদেশীয় স্বনামধন্য বিদর্শনগুরু নির্বাণধর্মে প্রয়াত উ· বা · খিন মহোদয়ের যোগ্যতম শিষ্য ও উত্তরাধিকারী। গুরুর কাছ থেকে লব্ধ জ্ঞান এবং তাঁর আজীবন সাধনা-লব্ধ জ্ঞান উভয়ের সমন্বয়-প্রসূত এই গ্রন্থ। এখানে যা কিছু ব্যক্ত হয়েছে তার সবই হচ্ছে সাধনা-লব্ধ প্রত্যক্ষ অনুভূতির কথা। এতে কোন পরম্পরার কথা নেই। নেই কোন ধর্ম-সম্প্রদায়ের কোনও দর্শনশাস্ত্রের অনুবাদ বা বস্তুসংক্ষেপ বা মর্মার্থ। এখানে নেই বিশ্বের ধর্ম ও দর্শনসমূহের কোন তুলনামূলক আলোচনা। এই গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে যথার্থ মনুষ্যত্ব বিকাশের ধর্ম, প্রণালী ও শৈলী। **'সকল ধর্ম মাঝে মানবধর্ম সার ভুবনে'**। এই মানবধর্মের স্বরূপ কি হওয়া উচিত? আহার-নিদ্রা-মৈথুন, নানাবিধ সংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের ঊর্ধ্বে যে যথার্থ মনুষ্যত্ব আছে— যা সর্বদেশে সর্বকালে সর্ব সম্প্রদায়ে এক ও অভিন্ন—তার বিকাশ কিভাবে সম্ভব?—ইত্যাদি জিজ্ঞাসার যথার্থ সমাধান রয়েছে এই গ্রন্থে। যুগে যুগে মহাপুরুষেরা সাধনা করে গেছেন মানবজাতির সার্বিক উন্নতির পন্থা আবিষ্কারের জন্য। তাঁরা প্রচার করেছেন তাঁদের সেই সাধনালব্ধ 'সত্য'। প্রকৃত 'সত্য' কখনও একাধিক হতে পারে না, সত্য এক ও অভিন্ন। কিন্তু আমরা এক একজন সত্যদ্রষ্টার নামানুসারে এক একটা সত্যধর্মের নাম দিয়েছি যেমন বুদ্ধ-ধর্ম, খৃষ্ট-ধর্ম, মুহম্মদ-ধর্ম, এবং কালক্রমে প্রত্যেক বিশ্বে আজ ধর্মের নামে যা কিছু চলছে সবই হচ্ছে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নিজ নিজ সংস্কার, বিশ্বাস ও মতবাদ যার সঙ্গে ধর্মের বিন্দুমাত্র সম্বন্ধ নেই, যার মধ্যে সেই সেই মহাপুরুষগণ কর্তৃক প্রচারিত তথতা বা সত্যের লেশমাত্রও নেই।—তাই আজ বিশ্ব আবার হিংসায় বিক্ষুব্দ হয়েছে। স্বার্থে স্বার্থে সংঘাত বেধেছে। মানুষ নিজেকে নিজে জানবার চেষ্টা করছে না। তার কাছে এখন আহার-নিদ্রা-মৈথুনই পরমার্থ। বিজ্ঞানের চরম উন্নতি হয়েছে, শিক্ষার আশাতীত অগ্রগতি হয়েছে। কিন্তু তথাপি মানুষ মূল লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট হয়ে গেছে। সে যা কিছুই করছে সবই যেন ঐ আহার-নিদ্রা-মৈথুনকেই কেন্দ্র করে সব করছে।

আর সুযোগ বুঝে স্বার্থান্ধ তথাকথিত ধর্মীয় পুরোহিতকুল নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কতকগুলো মিথ্যা সংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস জগদ্দল পাথরের মত মানুষের বুকে চাপিয়ে দিয়ে অনন্তকাল ধরে তাদের দাসত্বের শৃঙ্খলে বেঁধে রেখেছে। তাই কল্যাণমিত্র গোয়েঙ্কাজী তাঁর **"ধর্ম—জীবন জীনে কী কলা"**গ্রন্থের মাধ্যমে মানুষকে সেই দাসত্ব থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছেন। তাঁর বক্তব্য হ'ল সংক্ষেপে এইরূপ ঃ

মানুষ জানে না যে, সে কত অপরিসীম শক্তির অধিকারী—যে শক্তির পূর্ণ বিকাশ ঘটলে সে স্বর্গের দেবতাদেরও নতি স্বীকার করতে বাধ্য করতে পারে। অন্ধ মানুষ এটা বোঝে না যে এমন কোন অদৃশ্য মহাশক্তি নেই যাকে যাগ-যজ্ঞ, পূজা-নৈবেদ্য দিয়ে তুষ্ট করতে পারলে মানুষকে তিনি দেবেন স্বর্গ মোক্ষ সুখ—আর যিনি রুষ্ট হলে হবে মানুষের চরম সর্বনাশ। মানুষ নিজেই নিজের ত্রাণকর্তা, নিজেই নিজের প্রভু। অন্য কোন অদৃশ্য প্রভু বা ত্রাণকর্তা নেই। মানুষ যদি শুভবুদ্ধিপ্রণোদিত হয়ে তার ব্যক্তিত্বকে জাগাতে পারে, মনুষ্যত্বকে বিকশিত করতে পারে—তাতেই তার নিজের, সমাজের ও বিশ্বের অশেষ কল্যাণ সাধিত হবে। থাকবে না মানুষে-মানুষে, সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে দেশে-দেশে কোন ভেদাভেদ। থাকবেনা স্বার্থে-স্বার্থে সংঘাত, লোভে-লোভে দ্বন্দ্ব। মানুষের নিজের মধ্যেই নিজের জ্ঞানপ্রদীপ জ্বালতে হবে এবং দূর করতে হবে যুগ যুগ ধরে পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত নানা অন্ধবিশ্বাসের জমাট অন্ধকার। মানুষ নিজেই নিজের শরণ বা আশ্রয়। অন্য কোন শরণের প্রয়োজন নেই। মানুষের সুখ, মানুষের মুক্তি, মানুষের ভবিষ্যত তার নিজেরই হাতে। এজন্য তার প্রয়োজন নিজের কর্মশুদ্ধি। কায়কর্মশুদ্ধি, বাক্‌কর্মশুদ্ধি এবং মনঃকর্মশুদ্ধি। চাই সৎ সংকল্প, সৎ দৃষ্টিভঙ্গি এবং শুভবিষয়ে চিত্তের একাগ্রতা। লোকদেখানো আচার বা সংস্কারের কোন প্রয়োজন নেই। মানুষের নিজের মধ্যেই আছে ধর্ম এবং অধর্মের বীজ, ভগবান এবং শয়তান। অতএব, নিজেকেই জানবার চেষ্টা কর। সেই সনাতন মানব ধর্মের কথা, সত্যদ্রষ্টা মহামানবগণের কথা—**আত্মানং বিদ্ধি**। নিজেকে জান। অতন্দ্র প্রহরীর মত নিজের মনকে পাহারা দাও যেন সে বিপথগামী না হতে পারে। তীর্থস্থান, ধর্মস্থানে পরিভ্রমণ, যাগ-যজ্ঞ, দান-ধর্ম, পূজো-অর্চনা, স্নান-তর্পণ, উপবাস-ব্রতপালন, মালা-তিলক-গেরুয়া ধারণ সবই অর্থহীন হয়ে যাবে যদি না মানুষ কায়-বাক-মনঃ-কর্ম সম্পাদনে সংযত না হয়।

মহাপুরুষেরা তো পথের নির্দেশক মাত্র। কিন্তু পথ দিয়ে আমাদেরই চলতে হবে লক্ষ্যস্থানে পৌছুবার জন্য । ধর্মগ্রন্থাদি পাঠ এবং শ্রবণ থেকে আমরা প্রেরণা পেতে পারি এবং ধর্মজীবনে প্রবেশ করার যথার্থ সৎ পথের নির্দেশ পেতে পারি। কিন্তু স্বয়ং ধর্মকে ধারণ না করলে অর্থাৎ স্বয়ং ধর্মজীবনে প্রবেশ না করলে শুধু ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও শ্রবণ নিরর্থক। শ্রবণ ও পাঠকেই যদি আমরা যথাসর্বস্ব বলে মনে করি, ধর্মগ্রন্থের পূজা এবং ধর্মগ্রন্থকে মাথায় নিয়ে শোভাযাত্রা

করাকেই যদি আমরা যথাসর্বস্ব বলে মনে করি, ধর্মগ্রন্থের বাণীকে লক্ষবার লিপিবদ্ধ করা ও আবৃত্তি করা এবং কোন উপাস্য দেবতার উদ্দেশ্যে লক্ষবার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম নিবেদন এবং লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে পূজো-নৈবেদ্য নিবেদনকেই যদি আমরা ধর্মের সব কিছু বলে মনে করি—তাহলে অন্ধ কুসংস্কারের চোরাবালিতে আমাদের জীবন-তরী আটকে যাবেই।

লক্ষ লক্ষ টাকা দান করলেও সেটা নিরর্থক হবে যদি না সেটা নিষ্কাম হয়। ঘৃণা, বিদ্বেষ, আতঙ্ক ও স্বার্থ প্রণোদিত হয়ে দান করলেও নিরর্থক হবে। সদাচারবিহীন হয়ে উপবাস করাও নিরর্থক। নিরামিষ ভোজনও নিরর্থক যদি না চিত্ত শুদ্ধ ও নিষ্কাম থাকে। পক্ষান্তরে সামিষ ভোজনও শ্রেয়ঃ যদি না তার দ্বারা চিত্ত ক্লিষ্ট হয়, মোহগ্রস্ত হয় এবং প্রমাদগ্রস্ত হয়। নদী, পুকুর বা সমুদ্রের জল শরীরের ময়লা পরিষ্কার করতে পারে, শরীরকে শান্ত, স্নিগ্ধ ও রোগমুক্ত করতে পারে—কিন্তু চিত্তের মালিন্য দূর করতে পারে না—তাই যদি হোত তাহলে সকল জলচর প্রাণীরাও স্বর্গ-মোক্ষ লাভ কর'ত।

মানুষের চিত্ত স্বভাবতই বিশুদ্ধ। কিন্তু বাহ্যিক বস্তুসমূহের সংস্পর্শে সেটা কলুষিত হয়। তাই ধর্মের প্রয়োজন। ধর্মকে বুকে বেঁধে রাখার জন্য নয়। ধর্মকে পালন করতে হবে, ধারণ করতে হবে। জীবনে প্রয়োগ করতে হবে। যতটা প্রয়োগ করবেন ততটা মঙ্গল। ধর্মের পথ দুর্গম, কিন্তু অগম্য নয়। সর্বদুঃখ থেকে মুক্তি দুঃসাধ্য, কিন্তু একেবারে অসম্ভব নয়। ধর্মরূপ ভেলাকে অবলম্বন করে দুঃখসাগর অতিক্রম করতে হবে। যথার্থ সত্য ও ধর্ম এক ও অভিন্ন। এটা সার্বজনীন, সার্বকালিক ও সার্বদেশিক। শীলবান, সমাধিবান ও প্রজ্ঞাবান হওয়া কি শুধু বৌদ্ধদেরই ধর্ম—অন্য কারও নয়? বীতরাগ, বীতদ্বেষ ও বীতমোহ হওয়া কি কেবল জৈনদেরই ধর্ম—অন্য কারও নয়? স্থিতপ্রজ্ঞ, অনাসক্ত, জীবন্মুক্ত হওয়া কি কেবল হিন্দুদেরই ধর্ম—অন্য কারও নয়? প্রেম এবং করুণার দ্বারা ওতপ্রোত হয়ে জনসেবা করা কি কেবল খৃষ্টানদেরই ধর্ম—অন্য কারও নয়? জাতপাতের ভেদাভেদ থেকে মুক্ত হয়ে সামাজিক সাম্যের জীবন যাপন করা কি কেবল মুসলমানদের ধর্ম—অন্য কারও নয়? ধর্মপালনের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে—'আমি মানুষ হব। ভাল মানুষ হব'। ভাল মানুষ হতে পারলেই তো ভাল হিন্দু, ভাল বৌদ্ধ, ভাল জৈন, ভাল মুসলমান ও ভাল খৃষ্টান হওয়া যায়। যদি ভাল মানুষই হতে পারা না যায়, যদি মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ না ঘটে, তাহলে বৌদ্ধ হয়ে থাকলেও কি হবে? হিন্দু, জৈন, খৃষ্টান বা মুসলমান হয়ে থাকলেই বা কি হবে? শুদ্ধ যে ধর্ম তা মনুষ্যত্ব বিকারেশই ধর্ম। সেটা হিন্দুও নয়, বৌদ্ধও নয়, জৈন-খৃষ্টান-পার্শী-মুসলমানও নয়। শুদ্ধ ধর্ম, শুদ্ধ ধর্মই। আমাদের সকলের জীবনে সেই শুদ্ধ ধর্ম জাগ্রত হোক। শুদ্ধ ও সৎ ধর্মের যথেষ্ট মূল্যায়ণ হোক, প্রতিষ্ঠা হোক। শুদ্ধ ধর্ম জীবনের অঙ্গ হয়ে থাক। এতেই নিজেরও কল্যাণ হবে, বিশ্বের সমগ্র মানবজাতিরও কল্যাণ হবে।

শুদ্ধ ধর্মের সার হচ্ছে **শীল** (সদাচার), **সমাধি** (চিত্তের একাগ্রতা) এবং **প্রজ্ঞা**। শীল হচ্ছে কায়িক এবং বাচিক দুষ্কর্ম থেকে বিরতি এবং সমাধি হচ্ছে চিত্তের একাগ্রতার সাহায্যে দুষ্কর্ম থেকে বিরতি অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি। প্রজ্ঞা হচ্ছে জীবন ব্যবহারে আগন্তুক সকল বাহ্য আলম্বনকে এবং নিজের ভেতরের মনোবিকারগুলোকে যথাযথভাবে এবং যথাস্বভাব জানতে থাকা, এবং তাতে অনাসক্ত থাকা। একমাত্র বিদর্শন ভাবনার দ্বারাই এটা সম্ভব—কারণ বিদর্শন ভাবনার দ্বারা মনোবিকারগুলোকে সাক্ষীভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায় এবং ফলে আস্তে আস্তে সেই বিকারগুলো ক্ষীণ হয়ে নির্মূল হয়ে যায়। বিকারমুক্ত চিত্তেই অনাবিল সুখ ও শান্তি লাভ করা যায়। নিজেও সুখী হওয়া যায়, অন্যদেরও সুখী করা যায়। অতএব, আসুন বিদর্শনের নিয়ত অভ্যাসের দ্বারা প্রকৃত সুখী হোন এবং অন্যদেরও সুখী করুন—এটাই মঙ্গল কামনা।

* * *

আমাদের পরম সৌভাগ্য যে এই অমূল্য গ্রন্থ আমরা প্রকাশ করতে পেরেছি। আশা করি এই গ্রন্থপাঠে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে অনেকেই উপকৃত হতে পারবেন। কল্যাণমিত্র শ্রী গোয়েঙ্কাজী এবং "সয়াজী উ বা খিন মেমোরিয়ল ট্রাষ্ট"এর কর্তৃপক্ষের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ যে এই গ্রন্থখানি প্রকাশ করার সুযোগ আমরা লাভ করেছি। গ্রন্থখানির বঙ্গানুবাদ করে দিয়ে ডঃ সুকোমল চৌধুরী সকলের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে ধন্যবাদ দেওয়ার ভাষা আমার নেই। নানা কর্মব্যস্ততার মধ্যেও বহুজনহিতায় তিনি এই কাজ সুসম্পন্ন করেছেন। সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থ-প্রকাশন বিভাগের সম্পাদক পণ্ডিত ননীগোপাল তর্কতীর্থ মহাশয় এই গ্রন্থের প্রুফ সংশোধন করে দিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। গ্রন্থের শেষে 'পরিশিষ্ট' অংশটিরও তাঁরই ইচ্ছায় সন্নিবেশিত হয়েছে। পরিশিষ্টের কুড়িটি দোহাঁ মূলতঃ মূল গ্রন্থের কুড়িটি পরিচ্ছেদের সংক্ষিপ্তসার। বঙ্গানুবাদ করে দিলে মাধুর্য নষ্ট হবে এবং সুর ও ছন্দের পতন ঘটবে—এইজন্য অনুবাদ না করে মূল হিন্দীটাই রাখা হয়েছে। আর মূল হিন্দীটাও এত সুবোধ্য যে, বাস্তবিক অনুবাদের প্রয়োজনও নেই। সদ্ধর্মপ্রাণ শ্রীভূপতি মোহন বড়ুয়া গোয়েঙ্কাজীর সংক্ষিপ্ত জীবনকথা লিখে দিয়েছেন যা 'কল্যাণমিত্র শ্রীগোয়েঙ্কাজী' নামে গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে—সেজন্য তিনি ধন্যবাদভাজন। পরিশেষে ধন্যবাদ দেবো তাঁদের সকলকে যাঁদের অর্থ সাহায্য না পেলে এই গ্রন্থের মুদ্রণ সম্ভব হ'ত না। অলমতিবিস্তরেণ। সব্বে সত্তা সুখিতা হোন্তু।

প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাস্থবির
সভাপতি
বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্র
কলিকাতা

'কল্যাণমিত্র' গোয়েঙ্কাজী

কল্যাণমিত্র শ্রীগোয়েঙ্কাজী

'কল্যাণমিত্র' শ্রীগোয়েঙ্কাজীর জন্ম ব্রহ্মদেশে। ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে তাঁর পিতাকে বেশীর ভাগ সময় ব্রহ্মদেশেই কাটাতে হয়েছে। গোয়েঙ্কাজী ব্রহ্মদেশেই বড় হন। শিক্ষা-দীক্ষা তাঁর সবই ঐদেশে। তিনি বিত্তশালী পরিবারের সন্তান। অগাধ সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন তিনি। কিন্তু ছোটবেলাতেই তাঁর মস্তিষ্করোগ—মাথার যন্ত্রণা। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই রোগও বাড়তে থাকে এবং অবশেষে সেটা দুরারোগ্য হয়ে পড়ে! অজস্র অর্থ ব্যয় করেও তিনি রোগমুক্ত হতে পারেন নি। শেষ পর্যন্ত প্রত্যহ ২/৩ বার Morphia ইন্‌জেকশন নিতে হোত। আজ থেকে প্রায় ২৬ বছর আগের কথা। বর্মার ডাক্তারেরা হাল ছেড়ে দিয়ে বললেন—বাঁচতে হলে বিদেশে গিয়ে উপযুক্ত চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। গোয়েঙ্কাজীর অর্থাভাব ছিল না। তিনি সুইজ্যারল্যাণ্ড, জার্মানী, ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা ও জাপানে গিয়ে বহুদিন অবস্থান করে চিকিৎসা করিয়েছেন। কিন্তু সবই নিষ্ফল হয়েছে। রোগ যা ছিল তাই থাকল। মাঝখান থেকে অপব্যয় হলো মূল্যবান সময়, অর্থ ও জীবনাশক্তির। তিনি ফিরে এলেন বার্মাতেই।

অবশেষে একদিন তাঁর একজন বিশিষ্ট বন্ধু U. Chan Htoon (পরবর্তীকালে তিনি বার্মার সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি এবং 'ওয়ার্ল্ড ফেলোশীপ অব্ বুদ্ধিষ্টস্'-এর সভাপতি হয়েছিলেন) তাঁকে নিয়ে গেলেন গুরুজী (সয়াজী) U. Ba Khin মহোদয়ের কাছে। তাঁকে দেখামাত্রই গোয়েঙ্কাজীর ভাবান্তর ঘটল। আলাপ করে জানতে পারলেন যে নিয়মিত বিদর্শন ধ্যান অভ্যাস করলে রোগ সেরে যাবে। গোয়েঙ্কাজী রাজী হলেন এবং ১০ দিনের ধ্যান শিবিরে যোগদানের সংকল্প করলেন।

কিন্তু সংকল্প সংকল্পই থেকে গেল। ইতিমধ্যে পুরো ছয় মাস কেটে গেল। গোয়েঙ্কাজীর মনে দ্বিধা ও ইতস্ততঃ ভাব। দ্বিধার কারণ একটাই—ধর্মীয় অন্ধসংস্কার। তিনি গোঁড়া সনাতনী হিন্দু পরিবারের সন্তান। কাজেই বৌদ্ধধর্ম মতে ধ্যান তিনি করবেন কি করে? তাঁর ধারণা ছিল তাঁকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নিতে হবে। তা ছাড়া দু'টো ব্যাপারে তাঁর ভুল ধারণা ছিল— (১) বৌদ্ধধর্ম হচ্ছে নিবৃতিমার্গের ধর্ম। সংসারত্যাগীদের ধর্ম। যাঁরা সংসারে থাকতে চান তাঁদের জন্য নয়। কাজেই তাঁর পূর্ণ যৌবনে তিনি নিবৃতিমার্গের পথিক কিছুতেই হবেন না। (২) ভগবদ্‌গীতার বাণী তাঁর কাণে সব সময় ধ্বনিত হতো—"স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ" অর্থাৎ স্বধর্মে থেকে মৃত্যুবরণও শ্রেয়ঃ, কিন্তু পরধর্ম ভয়াবহ।

এই 'স্বধর্ম' এবং 'পরধর্ম' সম্বন্ধে তাঁর ছিল ভুল ধারণা। তিনি ভেবেছিলেন 'স্বধর্ম' মানে নিজের ধর্ম (religion) এবং 'পরধর্ম' মানে অন্যের ধর্ম (religion)। এই দুরকম ভুল ধারণা থাকা সত্ত্বেও U. Ba Khin মহোদয়ের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব গোয়েঙ্কাজীকে তাঁর কাছে টেনে নিয়ে গেল ছয় মাস পরে। তিনি দশ দিনের ধ্যান শিবিরে অংশ গ্রহণ করলেন। অদ্ভুত পরিবর্তন এনে দিল তাঁর জীবনে এই মাত্র দশ দিনের বিদর্শন ধ্যান। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা-প্রসঙ্গে লিখছেন—

"These were the most illuminating days of my life. The migraine had proved a blessing in disguise. A new Goenka was born. A second birth was experienced in coming out of the shell of ignorance. It was a major turning point in my life. Now I was on the straight **path of Dhamma** without any blind alleys from which **one has to retreat** one's steps. I was on the royal road to **real peace** and happiness, to liberation and emancipation **from all** sufferings and miserires."

[এই দিনগুলো আমার জীবনে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিন। আমার মস্তিষ্করোগ অভিশাপের ছলে আশীর্বাদই এনে দিয়েছে। একজন নতুন গোয়েঙ্কার জন্ম হ'ল। অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এল একটি নতুন জীবন। আমার জীবনে মোড় ফিরিয়ে দিল। আমি এখন সদ্ধর্মের ঋজুপথের পথিক—এপথে কোন অন্ধ কানা গলি নেই যেখান থেকে কাউকে পেছনে ফিরে আসতে হবে। পরম শান্তি এবং সুখের এবং সর্বদুঃখমুক্তির রাজপথে আমি এখন বিরাজ করছি।]

সমস্ত দ্বিধা, সন্দেহ এবং আশংকা মিলিয়ে গেল। তাঁর মস্তিষ্করোগ অনেকটা কমে গেল। তিনি বুঝতে পারলেন তাঁর সত্তা হচ্ছে আর কিছুই নয়—কতকগুলো চাপা উত্তেজনা, ষড়যন্ত্র, বিদ্বেষ, ঘৃণা, ঈর্ষা, শত্রুতা প্রভৃতির জটিল গ্রন্থির সমন্বয়মাত্র। তিনি বুঝতে পারলেন, তাঁর সমস্ত দুঃখ-কষ্টের মূল কোথায় এবং কি করে তিনি সেই মূল উৎপাটিত করে শান্তিতে বিরাজ করবেন? তাঁর চিত্তরূপ বস্ত্রের মালিন্য পরিষ্কারক দ্রব্য তাঁর হাতে এসে গেছে। তিনি বলছেন—"অজ্ঞতাবশতঃ এতদিন আমি সেই জটিল গ্রন্থিগুলোতে আরও গিঁট লাগিয়ে গেছি, গিঁট খোলার চেষ্টা তো দূরের কথা। তাই আমার মধ্যে উত্তেজনা, ষড়যন্ত্র, বিদ্বেষ, ঘৃণা, ঈর্ষ্যা ইত্যাদি দিন দিন বেড়েই চলেছিল এবং ফলে আমার রোগও বেড়ে যাচ্ছিল।"

বিদর্শন ভাবনার অদ্ভুত ক্ষমতা। এই মুহূর্তে এই জীবনেই তিনি তাঁর প্রত্যক্ষ ফল উপলব্ধি করেছেন। ধর্মের **সন্দিট্ঠিক** এবং **অকালিক** গুণগুলো তাঁর কাছে আকর্ষণীয় হ'ল। তাঁর গুরুর মতো তিনিও প্র্যাকটিক্যাল মানুষ হয়ে গেলেন অর্থাৎ অতীত এবং ভবিষ্যতকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র 'বর্তমান'কেই গুরুত্ব দিতে লাগলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি শুধু রোগমুক্তই হলেন না, **ধর্ম** সম্বন্ধে তাঁর যে সন্দেহ ছিল তাও দূর হ'ল। তিনি বুঝলেন যে সংসারত্যাগীর পক্ষে অবশ্য

লক্ষ্যে পৌঁছানো সহজতর। কারণ তাঁর সাংসারিক ঝামেলা নেই। কিন্তু তাই বলে সংসারী ব্যক্তি যে লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারেন না, তা নয়। তবে সময় একটু বেশী লাগে—কারণ তাঁকে অনেক সময় অতিবাহিত করতে হয় সাংসারিক ঝঞ্ঝাট মেটাতে। এই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণ করে অতীতে ও বর্তমানে লক্ষ লক্ষ গৃহী ও সন্ন্যাসী, যুবা-বৃদ্ধ, নর-নারী, জাতি-ধর্ম-শ্রেণী-সম্প্রদায়-দেশ-পেশা-ভাষা-নির্বিশেষে মানবজাতি উপকৃত হয়েছেন। এই মার্গে কোন সংকীর্ণ সম্প্রদায়গত ব্যাপার নেই। এই মার্গ সার্বজনীন, সার্বকালিক এবং সার্বদেশিক। ব্যাধি যদি সার্বজনীন, সার্বকালিক এবং সার্বদেশিক হয়, তাহলে সেই ব্যাধি-উপশমকারী ঔষধ সার্বজনীন, সার্বকালিক এবং সার্বদেশি হবে না কেন? গোয়েঙ্কাজী সংসারে থেকেই, সংসারী হয়েই এই মার্গ অনুসরণ করে আশাতীত মানসিক উন্নতি লাভ করেছেন এবং তাঁর সাংসারিক কাজকর্ম ব্যবসা-বাণিজ্যাদি আগের চেয়ে আরও ভালভাবে সম্পাদন করতে পেরেছেন। তিনি অবশেষে উপলব্ধি করতে পারলেন যে 'স্বধর্ম' হচ্ছে শীল, সমাধি এবং প্রজ্ঞা এবং 'পরধর্ম' হচ্ছে লোভ, দ্বেষ এবং মোহ। কাজেই এতদিন পরে তিনি গীতার বাক্যের মর্মার্থ বুঝতে পারলেন এবং অনাবিল আনন্দে তাঁর মন ভরপুর হয়ে গেল।

কয়েক বছরের মধ্যেই তাঁর জীবনে, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে এবং যে কোন অবস্থার মোকাবিলায় তাঁর ব্যবহারে আমূল পরিবর্তন এল। তিনি বুঝলেন—সদ্ধর্মের পথ মানুষকে সমস্যা থেকে পলায়ন শিক্ষা দেয় না বরং এটা শিক্ষা দেয় সমস্যাকে মোকাবিলা করার জন্য এবং শক্তি জোগায় শান্তিপূর্ণভাবে এবং সমতা সহকারে সমস্যার মোকাবিলা করতে। এটা আমাদের যথার্থভাবে বাঁচার উপায় শিখিয়ে দেয়—নিজে সপরিবারে সুখে-শান্তিতে বাঁচা এবং সমাজের অন্যান্যদের সুখে-শান্তিতে বাঁচতে দেওয়া, এই পদ্ধতিতে মানুষের মন ক্রমশঃ শান্ত, শুদ্ধ এবং সুস্থির হয়। গোয়েঙ্কাজীরও হয়েছিল এবং ফলে তাঁর ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে তিনি আরও বেশী সময় দিতে লাগলেন। কাজেই লাভ দুই দিকেই—ভেতরে এবং বাইরে। ঐহিক এবং আধ্যাত্মিক। তাঁর গুরুজী U. Ba Khin আর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তিনি সরকারী কাজ কর্মে অনেক অনেক বেশী সময় দিতে পারতেন—এই বিদর্শন ধ্যান অভ্যাসের ফলে। লোকোত্তর মার্গে উন্নতি তো হোতই। এক সময় তিনি চারটি সরকারী পদের কাজ একসঙ্গে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করে রেকর্ড সৃষ্টি করেছিলেন। যেজন্য ৫৫ বছর বয়সে অবসর গ্রহণের পর সরকার তাঁকে আরও ১২ বছর সরকারী কাজে বহাল রেখেছিলেন। কাজেই গুরুজী U. Ba Khin এর জীবন তাঁর শিষ্যদের কাছে জ্বলন্ত উদাহরণ এবং প্রেরণার বিষয়। গোয়েঙ্কাজীও এর দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

সরকারী কাজে দিনের বহু সময় অতিবাহিত করেও সন্ধ্যা থেকে রাত্রিতে তিনি অনেক সময় দিতে পারতেন বিদর্শন-ধ্যান অনুশীলনকারীদের জন্য। তাঁর ধ্যান কেন্দ্রে (International Meditation Centre) এ সকলের সমান

অধিকার—দেশের অবসরপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি থেকে সামান্য পিওন, সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি থেকে অনুতপ্ত অপরাধী সকলেই সমান ব্যবহার পেত তাঁর কাছে। গোয়েঙ্কাজী তাই বলেছেন—

"আমার পুণ্যপারমীর ফলে ধর্মের প্রতিরূপ দেশ বার্মাতে আমার জন্ম হয়েছে এবং বড় হয়েছি। আমার সৌভাগ্য যে অষ্টাঙ্গিক মার্গের মূর্ত প্রতীক সয়াগী উ সংস্পর্শে আমি আসতে পেরেছি এবং তাঁর সান্নিধ্যে সুদীর্ঘ ১৪ বৎসর সদ্ধর্ম চর্চা করার সুযোগ লাভ করেছি। আমার জীবন ধন্য যেহেতু নিজে আমি পরম শান্তি ও সুখ পেয়েছি এবং অন্য অনেককেও সুখ এবং শান্তি দিতে পেরেছি। শিবিরে যোগদানের আগে সাধকদের যে চেহারা দেখি, শিবির শেষে তার অদ্ভুত পরিবর্তন দেখে আমার মন আনন্দে ভরে যায়। সদ্ধর্মের কি প্রভাব! মাত্র কয়েকদিনের অভ্যাস যদি মানুষের মধ্যে এরূপ পরিবর্তন এনে দিতে পারে তাহলে সারাজীবন অভ্যাস করলে কি না হবে? মানুষের শান্তি, মানুষের সুখ, মানুষের মুক্তি, মানুষের নির্বাণ তারই হাতের মুঠোর মধ্যেই নয় কি? অদৃশ্য কোন ঈশ্বর পরমেশ্বরের সাহায্যের দরকার আছে কি? মানুষ নিজেই নিজের প্রভু। নিজেই নিজের ত্রাণকর্তা। অজ্ঞ মোহান্ধ মানুষ জানে না বোঝে না যে সে কত অপরিসীম শক্তির অধিকারী।"

দশ বছর ধরে গুরুজীর পদতলে বসে গোয়েঙ্কাজী গুরুর ভাষণ হিন্দী ভাষায় তর্জমা করেছেন গুরুজীর ভারতীয় শিষ্যদের সুবিধার্থে। কিন্তু ১৯৬৯ সালের জুন মাসে বোম্বাইতে মাতার আশংকাজনক অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে গোয়েঙ্কাজী ভারতে চলে আসতে বাধ্য হন আরব্ধ কাজ অসম্পূর্ণ রেখে। বার্মার বিপ্লবী সরকার তাঁকে ভারতে আসা ও অবস্থানের জন্য ৫ বছরের মেয়াদী পাসপোর্ট প্রদান করেন। বোম্বাইতে এসে তাঁর মাতার আরোগ্যের জন্য গোয়েঙ্কাজী দশ দিনের ধ্যান শিবিরের ব্যবস্থা করেন। তাঁর মা সহ ১৪ জন এতে অংশগ্রহণ করেন। শিবির শেষে তাঁর মা অনেকটা সুস্থ বোধ করেন। অন্যান্য যাঁরা যোগদান করেছিলেন তাঁরাও যথেষ্ট উপকৃত হন। তাঁদের আগ্রহে তিনি আরও কয়েকটি শিবিরের ব্যবস্থা করেন যার প্রত্যেকটিতে তাঁর মাও যোগদান করেন। তারপর তো ধর্মের চাকা আপনা থেকেই ঘুরতে লাগল। সারা ভারতে রটে গেল তাঁর কথা, ভারতের নানা প্রান্ত থেকে তাঁর ডাক এল—শিবির খোলার জন্য। বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় গোয়েঙ্কাজী ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে বিদর্শন ধ্যান শিক্ষা দেন যাতে জাতিধর্মনির্বিশেষে শুধু ভারতীয় নয়, অনেক বিদেশীরাও অংশগ্রহণ করলেন। তাঁর গুরুর আশীর্বাদে গোয়েঙ্কাজী সর্বত্রই আশাতীত সাফল্য লাভ করলেন। তাঁকে ভারতবাসীরা আর ছাড়তে চায়না। বৌদ্ধ, জৈন, হিন্দু, মুসলমান, পার্শী, শিখ, খৃষ্টান, স্বদেশী, বিদেশী লক্ষ লক্ষ লোক তাঁর অনুগামী হ'ল। ১৯৭১ সালে বার্মায় তাঁর গুরুজী ইহধাম ত্যাগ করলেন। বার্মা থেকে তাঁর ডাক এল 'ইনটারন্যাশনাল মেডিটেশন সেন্টারে'র

দায়িত্ব নিতে। কিন্তু ভারতবাসীরা তাঁকে ছাড়লেন না। তাঁর আর বার্মায় ফিরে যাওয়া হোল না। বোম্বাইয়ের ইগতপুরীতে মনোরম পরিবেশে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন 'বিপশ্যনা বিশ্ববিদ্যাপীঠ'। বার্মার International Meditation Centre-এর অনুকরণে। আজ এই বিশ্ববিদ্যাপীঠ সারা বিশ্বের বিদর্শন-সাধকদের তীর্থস্থান। দেশ-বিদেশের লক্ষ লক্ষ লোক এই প্রতিষ্ঠানে এসে শিবিরে যোগদান করে আশাতীত উপকৃত হয়েছেন। সাদর আমন্ত্রণ পেয়ে বাধ্য হয়ে গোয়েঙ্কাজীকে এখন বিদেশে নানা স্থানে যেতে হচ্ছে বিদর্শন ধ্যান শিক্ষা দেবার জন্য। অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন কিছুকাল। আমরা তাঁর সুস্থ নিরাপদ দীর্ঘায়ু কামনা করি। ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের ন্যায় তিনি এদেশ থেকে অন্তর্হিত ধর্মগঙ্গা ব্রহ্মদেশ থেকে পুনরায় ভারতে বয়ে এনেছেন যার অমৃতবারি পান করে ভারতবাসী আবার পুনরুজ্জীবিত হয়েছে এবং হচ্ছে। তিনি যত দীর্ঘায়ু লাভ করবেন ততই ভারতবাসীর হিত এবং সুখ হবে। অজ্ঞতা অবিদ্যার অমানিশাকে বিদূরীত করে সদ্ধর্মের আলোক শুধু ভারতকে নয় সারা বিশ্বকে আবার আলোকোদ্ভাসিত করুক। সদ্ধর্মের দ্বারা সকল প্রাণীই উপকৃত হোক। সকলেই শাশ্বত শান্তি ও সুখলাভে ধন্য হোক। চিরং তিট্‌ঠতু সদ্ধম্মং।

বুদ্ধপুর্ণিমা, ১৩৮৭
৬৮, যোধপুর পার্ক
কলিকাতা—৭০০০৬৮

গুণমুগ্ধ
ভূপতি মোহন বড়ুয়া

শুভেচ্ছা

প্রখ্যাত বিদর্শন আচার্য সত্যনারায়ণ গোয়েঙ্কাজীর **"ধর্ম—জীবন জীনে কী কলা"** শীর্ষক গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ **"মনুষ্যত্ব বিকাশে ধর্ম"** বইটি বাংলাদেশে পুনঃ মুদ্রিত হইতেছে জানিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইলাম। মানব জাতির প্রধান সমস্যা জ্বরা ব্যাধি ও মৃত্যু সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের একই রূপ। এই সমস্যার সমাধানের জন্য বিদর্শন ভাবনাই প্রধান উপায়।

এই গ্রন্থে কোন ধর্মীয় গোঁড়ামীর প্রশ্রয় দেওয়া হয় নাই। এই গ্রন্থ যতই প্রকাশিত ও প্রচারিত হইবে ততই মানব সমাজের কল্যাণ সাধিত হইবে এবং ক্রমশঃ আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে বিকাশ লাভ ঘটিবে। এই গ্রন্থের সর্ব্বতোভাবে প্রচার-প্রসার কামনা করি।

ধর্মাধার মহাস্থবির

শুভার্থী
ধর্মাধার মহাস্থবির
সংঘরাজ
ভারতীয় সংঘরাজ মহাসভা

তারিখ :
ঢাকা
১৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৮

অনুক্রমণিকা

১.	ধর্ম কি?	১
২.	শুদ্ধ ধর্ম	৭
৩.	ধর্মের সার	৮
৪.	ধর্ম ধারণ	১৪
৫.	বুদ্ধি-বিলাস ধর্ম নহে	১৫
৬.	ধর্মের যথার্থ মূল্যায়ন	১৬
৭.	যথার্থ কুশল	২২
৮.	সমতা ধর্ম	২৩
৯.	সরল চিত্ত	২৯
১০.	ধর্মের সর্বহিতকারী স্বরূপ	৩১
১১.	ধর্মই রক্ষক	৩৪
১২.	'নাম'-এ কি আছে?	৩৫
১৩.	সত্য ধর্ম	৩৯
১৪.	বিপশ্যনা (বিদর্শন) কি?	৪১
১৫.	ধর্মচক্র	৪৪
১৬.	সম্যক্ ধর্ম	৪৫
১৭.	সত্যই ধর্ম	৫০
১৮.	ধর্ম-দর্শন	৫৭
১৯.	বিদর্শন কেন?	৬৪
২০.	আসুন, সুখ বন্টন করি	৬৯
২১.	পরিশিষ্ট	৭০

মনুষ্যত্ব বিকাশে ধর্ম

১· ধর্ম কি?

ধর্ম হচ্ছে জীবনযাত্রার প্রণালী—নিজে বাঁচা এবং অন্যদের সুখে বাঁচতে দেয়ার পন্থা। সকলেই সুখে বাঁচতে চায়, দুঃখ থেকে মুক্ত থাকতে চায়। কিন্তু যদি আমরা না জানি বাস্তবিক সুখ কি এবং এটাও না জানি কিভাবে তাকে পাওয়া যায়, তাহলে মিথ্যা তার পিছনে ছুটে লাভ কি? এতে বরং আমাদের দুঃখই বেড়ে যায়। নিজে দুঃখী হই এবং অন্যদেরও তার সামিল করি।

প্রকৃত সুখ আন্তরিক শান্তিতেই আছে এবং আন্তরিক শান্তি থাকে চিত্তের বিকার-বিহীন অবস্থাতে এবং চিত্তের বিশুদ্ধিতে। চিত্তের বিকার-বিহীন অবস্থাই প্রকৃত সুখ-শান্তির অবস্থা।

অতএব সত্যিকার শান্তি এবং প্রকৃত সুখ তিনিই উপভোগ করেন—যিনি নির্মল চিত্তে জীবন যাপন করেন। যিনি যতটা বিকার মুক্ত থাকেন তিনি ততটা দুঃখমুক্ত থাকেন, ততটা জীবন যাপনের যথার্থ উপায় জানেন এবং ততটাই তিনি ধার্মিক। নির্মল চিত্তের ব্যবহারই হচ্ছে ধর্ম। এটাই বাঁচার উপায়। এতে তিনি যতটা নিপুণ তিনি ততটা ধার্মিক। ধার্মিক শব্দের এটাই যথার্থ পরিভাষা।

প্রকৃতির এক অটুট নিয়ম আছে যাকে কেউ বলে সত্য কেউ বা বলে ধর্মনিয়ামতা—নামের ভেদ থাকলেও মূলে কোন ভেদ নেই। নিয়ম হচ্ছে এই যে, এরূপ করলে তার এরূপ পরিণাম হবেই। এরূপ না করলে, এরূপ পরিণামও হবে না। কারণ সমূহের পরিণামস্বরূপ যে কার্য সম্পন্ন হয়, ঐ কারণসমূহ না থাকলে সে কার্য সম্পন্ন হতে পারে না। এই নিয়ম অনুসারে যখন যখন আমাদের মন দ্বেষ, দৌর্মনস্য, ক্রোধ, ঈর্ষা ভয় প্রভৃতির দ্বারা আক্রান্ত হতে থাকে, তখন তখনই আমরা ব্যাকুল হয়ে পড়ি। দুঃখ-সন্তপ্ত হয়ে সুখ থেকে বঞ্চিত হয়ে যাই। আর যখন আমাদের মন এরূপ বিকার সমূহের দ্বারা বিকৃত হয় না, তখন আমরা ব্যাকুলতা থেকে মুক্ত থাকি। দুঃখ সন্তপ্ত হওয়া থেকে রক্ষা পাই। নিজের আন্তরিক সুখশান্তির অধিকারী হয়ে থাকতে পারি।

যেটা বিকারসমূহ থেকে মুক্ত থাকার উপায় শিক্ষা দেয়, সেটাই জীবন যাপনের যথার্থ উপায়, সেটাই শুদ্ধ ধর্ম। শুদ্ধ ধর্মের স্বরূপ বড়ই মঙ্গলময় এবং কল্যাণপ্রদ। আমরা যখন বিকার-বিমুক্ত হয়ে নির্মল চিত্তে কার্য করি, তখন নিজে তো বাস্তবিক সুখ-শান্তি ভোগ করে থাকি, অন্যদেরও সুখ-শান্তির কারণ হই। আবার যখন বিকারগ্রস্ত হয়ে মলিন চিত্তে কার্য করি তখন নিজে তো

সন্তপ্ত হয়েই থাকি, অন্যদেরও সন্তাপ দিয়ে থাকি। সমাজের শান্তিভঙ্গ করে থাকি।

ক্রোধ, লোভ, বাসনা, ভয়, মাৎসর্য, ঈর্ষা, অহংকার প্রভৃতি মনোবিকার সমূহের শিকার হয়ে আমরা হত্যা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যা, ছল, কপটতা, চুক্‌লি, পরনিন্দা, নিরর্থক প্রলাপ বকা, রুক্ষ, কর্কশ কথাবার্তা বলা ইত্যাদি কুকর্ম সম্পাদন করে থাকি। আর যখন তদ্রুপ আচরণ করি, তখন নিজের এবং পরের সন্তাপের কারণ হয়ে থাকি। মনোবিকার ছাড়া কোনও শারীরিক বা বাচনিক দুষ্কর্ম সম্পন্ন হতে পারে না। তবে এটা অনিবার্য নয় যে, মনোবিকার উৎপন্ন হলেই আমরা কায়িক বা বাচনিক দুষ্কর্ম সম্পাদন করে থাকি। নানাভাবে প্রবল মনোবিকারসমূহ উৎপন্ন হলেও আত্মদমনের দ্বারা আমরা তদ্রুপ কায়িক এবং বাচনিক দুষ্কর্ম থেকে রক্ষা পেতে পারি। এবং এর দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে অন্যদেরও ক্ষতি করা সম্ভব হয় না। অন্যদিকে দূষিত মনোবিকার সমূহের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে যদি মন ব্যাকুল হয়ে থাকে তাহলে মানবিক দুষ্কর্ম তো সাধিত হবেই। এর দ্বারা নিজেরও শান্তি নষ্ট হয় এবং পরোক্ষভাবে অন্যদেরও শান্তি ভঙ্গ করা হয়। আমাদের মনের দূষিত তরঙ্গগুলো আশেপাশের বাতাবরণকে প্রভাবিত এবং দূষিত না করে থাকতে পারে না।

আমাদের মন যখন বিকার-বিমুক্ত এবং নির্মল থাকে তখন স্বাভাবিকভাবেই ইহা স্নেহ এবং সদ্ভাব, মৈত্রী এবং করুণার দ্বারা পূর্ণ হয়। তখন আমরা নিজে সুখ-শান্তি তো অনুভব করেই থাকি, পরোক্ষভাবে অন্যদেরও সুখ-শান্তি দিয়ে থাকি। আমাদের নির্মল চিত্তের তরঙ্গগুলো আশেপাশের বাতাবরণকেও প্রভাবিত করে এবং তাকে বিশুদ্ধ করে।

অতএব আত্মদমনই কেবল ধর্মের সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণতা নয়। তবে ধর্ম ধারণ করার প্রথম পদক্ষেপ তার থেকেই আরম্ভ হয়। প্রথমে তো সংযম-সংবর দ্বারা আমাদের কায়িক এবং বাচনিক দুষ্কর্ম থেকে বিরত হতে হবে এবং তারপর সতত অভ্যাস দ্বারা মানসিক দুষ্কর্ম থেকে বিরত হতে হবে। মানসিক দুষ্কর্ম থেকে বিরত হওয়া মানে মানসিক বিকারসমূহ থেকে মুক্ত হয়ে যাওয়া। বিকার-বিহীন নির্মল চিত্ত নিজের সহজ স্বভাবের দ্বারাই কোন মানসিক, বাচনিক বা শারীরিক দুষ্কর্ম সম্পাদন করতে পারবে না। অতএব, আসল কথা হোল—নিজের চিত্তকে বিকারসমূহ থেকে বিমুক্ত রাখা।

আমরা নিজেদের প্রত্যেক কর্মের প্রতি সজাগ থেকেই তাকে দোষমুক্ত রাখতে পারি। নিজের চিত্ত এবং চিত্তের বিকারসমূহের প্রতি সজাগ থেকেই তাকে আমরা দোষমুক্ত রাখতে পারি। চিত্তের অজ্ঞান এবং মূর্চ্ছিত থাকা অবস্থায় আমরা তাকে কখনও বিশুদ্ধ করতে পারি না এবং এর বিশুদ্ধতাকে রক্ষা করতে পারি না। অতএব নিজের শারীরিক, বাচনিক এবং মানসিক কর্মসমূহকে এবং নিজের চিত্ত ও চিত্তবৃত্তিসমূহকে সতত নিরীক্ষণ করতে থাকার অভ্যাসই ধর্ম ধারণ করার যথার্থ অভ্যাস। কোনও কর্ম সম্পাদন করার পূর্বে এবং করার

সময়ে এটা চিন্তা করতে হবে যে এই কর্মের দ্বারা আমার বা অন্যদের মঙ্গল হবে, না অমঙ্গল। যদি মঙ্গল হয় তাহলে করতে হবে, অমঙ্গল হলে করা থেকে বিরত হতে হবে। এইভাবে ভালমন্দ বিবেচনা করে কর্ম সম্পাদিত হলে তা মঙ্গলময়ই হবে। মঙ্গলময় হলে ধর্মময়ও হবে। যদি কখনও অন্যমনস্কতাবশতঃ বিবেচনা না করে কোন কায়িক বা বাচনিক দুষ্কর্ম সম্পাদিত হয়ে যায়, যা নিজের বা অন্যদের পক্ষে অহিতকর, তাহলে তা নিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য ব্যাকুল না হয়ে যথাশীঘ্র সম্ভব নিজের কোন বন্ধু সাধক অথবা গুরুজনের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁর কাছে নিজের ভুল স্বীকার করে ভারমুক্ত হওয়া উচিত এবং ভবিষ্যতে আরও বেশী সাবধান থাকার জন্য কৃতসঙ্কল্প হওয়া উচিত। চিত্তের প্রতিও এইরূপ সজাগ থাকার অভ্যাস বাড়াতে হবে। যখনই চিত্তে কোন বিকার উৎপন্ন হবে তখনই তাকে নিরীক্ষণ করতে হবে। সাক্ষীর ন্যায় নিরীক্ষণ করতে থাকলেই তা দুর্বল হয়ে হয়ে বিনষ্ট হয়ে যাবে। কখনও অনবধানবশতঃ যদি তাকে নিরীক্ষণ করা সম্ভব না হয় এবং পরিণামে তা আপনার উপর নিজের অধিকার বিস্তার করে, তবুও তাকে ভেবে ভেবে ভেঙে পড়া অনুচিত। বরং আরও বেশী সাবধান থাকার জন্য কৃতসঙ্কল্প হবেন এবং সজাগ থাকার অভ্যাস বাড়াবেন। শুদ্ধ ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হবার এটাই বৈজ্ঞানিক প্রণালী।

যে অভ্যাসের দ্বারা নিজের কর্মসমূহের প্রতি সতর্ক প্রহরা এবং সাবধানতা গড়ে উঠে তাই শুদ্ধ ধর্মের অভ্যাস। যে বিধির দ্বারা নিজের কর্মসমূহের শোধনকারী চিত্তবিশুদ্ধি আসে, তাই ধর্মবিধি।

যখন আমরা আত্ম-নিরীক্ষণ করে অনুভূতিসমূহের পর্যালোচনা করি তখন দেখতে পাই যে প্রত্যেক দুষ্কর্মের কারণ হচ্ছে নিজের চিত্তের মালিন্য । কোন না কোন মনোবিকার। আমরা এটাও দেখতে পাই যে, প্রত্যেক বিকারের কারণ নিজেরই 'অহং'এর প্রতি উৎপন্ন গভীর আসক্তি। যখন আসক্তির অন্ধকারে এই 'আমি'কে অত্যধিক গুরুত্ব দিয়ে তারই বশীভূত হয়ে পড়ি, তখনই সঙ্কুচিত মানসিক অবস্থায় আবদ্ধ হয়ে মনোমালিন্যহেতু কোন না কোন এমন কর্ম করে ফেলি যা পরিণামে অকুশল।

আত্মনিরীক্ষণের অভ্যাসের দ্বারা নিজের অনুভূতিবলে এটা স্পষ্ট হয় যে যখন স্বার্থান্ধ হয়ে আমরা বিকারগ্রস্ত হই তখন অন্যদের অনিষ্ট তো করিই, নিজের স্বার্থও বিঘ্নিত করি। আর যদি এই বিকার থেকে মুক্ত থাকতে পারি তাহলে আত্মহিত এবং পরহিত উভয়ই সাধিত হবে। আত্মহিত এবং পরহিত সাধন করার কর্মই ধর্ম। যাতে আত্মলাভের সঙ্গে সঙ্গে পরলাভও সাধিত হয় তাই ধর্ম। যার দ্রারা কারও অনিষ্ট হয়, তা অধর্মই। আত্মোদয় এবং সর্বোদয়ের সামঞ্জস্যপূর্ণ সুস্থ জীবনই ধর্ম। আত্মোদয় এবং সর্বোদয় একে অন্যের উপর আশ্রিত।

আমাদের সৎকর্ম এবং দুষ্কর্ম কেবল আমাদেরই সুখী বা দুঃখী করে না। বরং আমাদের সঙ্গীসাথীদেরও তা প্রভাবিত করে। মানুষ সমাজের অন্য সদস্যদের

সঙ্গে বাস করে। মানুষ সমাজেরই একটি অবিভাজ্য অঙ্গ। মানুষ সমাজের দ্বারা নিজে প্রভাবিত হয় এবং সমাজকেও সে কমবেশী প্রভাবিত করে থাকে। এইজন্য ধর্ম সাধন দ্বারা যখন আমরা নৈতিক জীবন যাপন করি, দুষ্কর্ম থেকে মুক্ত থেকে সৎকর্ম সম্পাদনে রত হই, তখন কেবল নিজেরই যে ভাল হয় তা নয়, বরং সমাজের অন্যান্যদেরও ভাল হয়।

জীবনমূল্যের জন্যই তো ধর্মসাধন। যদি ধর্মের অভ্যাসের ধারা জীবনমূল্য উর্ধ্বগামী না হয়, আমাদের লোক-ব্যবহার যদি শুদ্ধ না হয়, আমরা নিজের জন্য এবং অন্যদের জন্য মঙ্গলময় জীবন যদি যাপন করতে না পারি তা'হলে ধর্ম আমাদের কোন্ কাজে লাগবে? কারও কোন কাজে লাগবে কি? ধর্ম এই জন্যই আছে যে, যেন আমাদের পরস্পরের সম্বন্ধ শুদ্ধ হয়, যেন আমাদের মধ্যে ব্যবহার-কুশলতা আসে। পরিবার, সমাজ, জাতি, রাষ্ট্র এবং অন্তর্রাষ্ট্রীয় সমস্ত পারস্পরিক সম্বন্ধ ব্যক্তি-ব্যক্তির সম্বন্ধের উপরই নির্ভর করে।অতএব শুদ্ধ কর্ম হচ্ছে—প্রত্যেক ব্যক্তি এখানেই, এই জীবনেই অন্যদের সঙ্গে নিজের ব্যবহার সম্বন্ধ শুদ্ধ করবে। এই জীবনেই সুখ-শান্তিতে বাঁচার জন্যই ধর্ম। মৃত্যুর পরে অনন্ত আকাশের পরপারে কোন অজ্ঞাত স্বর্গের জীবন যাপনের জন্য নয়। মৃত্যুর পরে পৃথিবীর নীচে কোন অজ্ঞাত নরক থেকে বাঁচার জন্যও নয়। ধর্ম হচ্ছে আমাদের নিজেদের অভ্যন্তরে সমাহিত স্বর্গের সুখভোগ করার জন্য। অন্যদিকে ধর্ম হচ্ছে আমাদের নিজেদের অভ্যন্তরে সময়ে সময়ে যে নারকীয় অগ্নি জ্বলে ওঠে তাকে শান্ত করার জন্য এবং তার থেকে উদ্ধার পাবার জন্য। ধর্ম হচ্ছে **সাংদৃষ্টিক** অর্থাৎ প্রত্যক্ষ। এই জীবন এবং এই জগতের জন্যই। বর্তমানের জন্য যিনি নিজের বর্তমানকে শুদ্ধ করে ফেলেছেন তাঁর ভবিষ্যতের চিন্তা করার প্রয়োজন নেই। ওঁর ভবিষ্যত আপনা থেকেই শুদ্ধ হয়ে যায়। যিনি ইহলোকের শুদ্ধি করেছেন, তাঁর পরলোকের চিন্তা নেই। তাঁর পরলোক আপনা থেকেই শুদ্ধ হয়ে যায়। যিনি নিজের বর্তমানকে শুদ্ধ করতে পারেননি এবং কেবল ভবিষ্যতের আশায় থাকেন, পরলোকের প্রতি উন্মুখ হয়ে বসে থাকেন, তিনি নিজেই নিজেকে প্রবঞ্চিত করেন, নিজের বাস্তবিক মঙ্গল থেকে বঞ্চিত হন, এবং শুদ্ধ ধর্ম থেকে দূরে থাকেন। ধর্ম হচ্ছে **অকালিক**। তা এখন এবং এই জন্মেরই ফলপ্রদায়ী। ধর্মের নামে কোন অনুষ্ঠান করে যদি এখানে তার ফল পাওয়া না যায় বিকার-বিহীন চিত্তবিশুদ্ধির প্রকৃত সুখ এখানে এই জীবনে যদি পাওয়া না যায়, তাহলে বুঝতে হবে আপনি কোন প্রবঞ্চনাতে মশগুল হয়ে আছেন। শুদ্ধ ধর্ম থেকে বঞ্চিত হয়ে আছেন। ধর্ম সকলের জন্য এই জীবনকে সুখ-শান্তিময় করিবার হেতু এবং পরোক্ষ কোন সুদূর ভবিষ্যতের চিন্তা থেকে মুক্ত রাখার কারণ—এটাই ধর্ম। এটাই ধর্মের শুদ্ধতা। ইহাই শুদ্ধধর্মের জীবন। যার আবশ্যকতা সার্বজনীন।

ধর্ম সার্বজনীন, এইজন্য শুদ্ধ-ধর্মের সঙ্গে সম্প্রদায়ের কোন সম্বন্ধ নেই, কোন

লেন-দেন নেই। শুদ্ধ-ধর্মপথের পথিক যখন ধর্ম পালন করেন, তখন কোন সম্প্রদায়-বিশেষের নিষ্প্রাণ রীতি-নীতি পূর্ণ করার জন্য নয়, কোন গ্রন্থবিশেষের বিধিবিধানের অনুষ্ঠান পূর্ণ করার জন্য নয়, মিথ্যা অন্ধবিশ্বাসজাত সংস্কার পরম্পরার শিকার হয়ে কোন বন্ধজীবনের অনুগামী হবার জন্য নয়— বরং শুদ্ধ ধর্মের অনশীলনকারী নিজের জীবনকে সুখী এবং সুস্থ করার জন্যই ধর্মের পালন করেন। ধার্মিক জীবন যাপনের জন্য ধর্মের ভালমন্দ বুঝে তাকে আত্মকল্যাণ এবং পরকল্যাণের কারণ জেনেই তাকে পালন করেন। না বুঝে কেবল অন্ধবিশ্বাসহেতু অথবা কোন অজ্ঞাত শক্তিতে সন্তুষ্ঠ এবং প্রসন্ন করার জন্য অথবা তার ভয়ে আশংকিত-আতংকিত হয়ে ধর্মের পালন করেন না। ধর্মের পালন কলুষ সমূহের দমন করার জন্য নয়, বরং প্রজ্ঞাপূর্বক সেগুলোর পূর্ণ প্রশমন করার জন্য। ধর্মের পালন কেবল নিজের জন্য নয়, বরং বহুজনের হিতসুখ, মঙ্গল-কল্যাণ এবং বহুজনের স্বস্থি-মুক্তির জন্যও বটে।

ধর্মের পালন এটা বুঝেই করা উচিত যে ধর্ম সার্বজনীন, সর্বজনহিতকারী। কোন সম্প্রদায়বিশেষ, বর্ণবিশেষ বা জাতিবিশেষের দ্বারা ধর্ম আবদ্ধ নয়। যদি ঐরূপ হয়, তাহলে ধর্মের শুদ্ধতা নষ্ট হয়ে যায়। ধর্ম ততক্ষণই শুদ্ধ যতক্ষণ সেটা সার্বজনীন, সার্বদেশিক এবং সার্বকালিক থাকে। ধর্ম সকলেরই জন্য কল্যাণকারী, মঙ্গলকারী এবং হিতসুখকারী। সকল মানবের দ্বারা সরলতা পূর্বক বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করার যোগ্য।

বিশুদ্ধ বায়ুমণ্ডলে থাকা, শুদ্ধ-স্বচ্ছ বায়ু সেবন করা, শরীর স্বচ্ছ রাখা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড় পরা, শুদ্ধ-স্বচ্ছ সাত্ত্বিক ভোজন আমাদের এই জন্যই করা উচিত যে এগুলো আমাদের পক্ষে হিতকর। কিন্তু ধর্ম কেবল নিজের জন্য নয়, কোন জাতিবিশেষ, বর্ণবিশেষ বা সম্প্রদায় বিশেষের জন্য নয়, বরং সকলের জন্য সমান ভাবে হিতকর। কেবল আমি নই, যে কোন ব্যক্তি যদি অসুদ্ধ, অস্বাস্থ্যকর বাতাবরণে থাকে, দুর্গন্ধ বিষাক্ত বায়ু সেবন করে, নিজের শরীর এবং কাপড়-চোপড় অপরিচ্ছন্ন রাখে, অপরিষ্কার এবং দূষিত দ্রব্য ভোজন করে তাহলে তার স্বাস্থ্যহানি হবে, সে রোগী হবে, দুঃখী হবে। এই নিয়ম সার্বজনীন। কোন এক ব্যক্তিবিশেষ বা কোন এক জাতিবিশেষের জন্য ঐ নিয়ম নহে। ঠিক তদ্রুপ যখন কেউ নিজের মনকে বিকারসমূহ দ্বারা বিকৃত করে সে তখন ব্যাকুল হয়ে যায়। তার বাত-পিত্ত-কফে বিষমতা উৎপন্ন হয়। সে রোগগ্রস্থ হয়। স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের সাধারণ নিয়ম সকলেরই শরীর এবং মনের উপর সমানভাবে প্রযোজ্য। প্রকৃতি এটা দেখে না যে এই নিয়মের লঙ্ঘনকারী ব্যক্তিটি কে, কোন জাতির বা কোন সম্প্রদায়ের? প্রকৃতি কোন সম্প্রদায় বিশেষের ব্যক্তির উপর কৃপা করে না বা অন্য কারও উপর কোপ করে না। ম্যালেরিয়া ম্যালেরিয়াই। হিন্দু বা বৌদ্ধ নয়, জৈন বা পার্শী নয়, মুসলমান বা খৃষ্ঠান নয়। ঠিক তদ্রুপ কুইনাইন কুইনাইনই। তাহাও হিন্দু নয়, বৌদ্ধ নয়, জৈন বা পার্শী

নয়, মুসলমান বা খৃষ্ঠান নয়। এইভাবে ক্রোধ, ঈর্ষা, দ্বেষ প্রভৃতি বিকারও হিন্দু নয়, জৈন বা পার্শী নয়, মুসলমান বা খৃষ্ঠান নয়। অনুরূপ ভাবে ওগুলো থেকে বিমুক্ত থাকাও না হিন্দু, না বৌদ্ধ, না জৈন বা পার্শী, না মুসলমান বা খৃষ্ঠান। বিকারসমূহ থেকে বিমুক্ত থাকাই শুদ্ধ ধর্ম। অতএব শুদ্ধ ধর্ম না হিন্দু, না বৌদ্ধ, না জৈন, না পার্শী, না মুসলমান, না খৃষ্ঠান। তা কেবল শুদ্ধ ধর্মই।

ধর্ম হচ্ছে এক আদর্শ জীবনশৈলী, সুখে থাকার বিশুদ্ধ পদ্ধতি, শান্তি লাভ করার বিমল পন্থা, সর্বজনকল্যাণপ্রদ আচার-সংহিতা, যা সকলের জন্য।

শীলবান, সমাধিবান, প্রজ্ঞাবান হওয়া কি কেবল বৌদ্ধদেরই ধর্ম? অন্য কারও নয়? স্থিতপ্রজ্ঞ, অনাসক্ত, জীবনমুক্ত হওয়া কি কেবল হিন্দুদেরই ধর্ম? অন্য কারও নয়? প্রেম এবং করুণার দ্বারা ওতপ্রোত হয়ে জনসেবা করা কি কেবল খৃষ্ঠানদেরই ধর্ম? অন্য কারও নয়? জাতপাতের ভেদাভেদ থেকে মুক্ত হয়ে সামাজিক সমতার জীবন যাপন করা কি কেবল মুসলমানদের ধর্ম? অন্য কারও নয়?— ধর্মপালনের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে—'আমি মানুষ হব। ভাল মানুষ হব।' ভাল মানুষ হতে পারলেই তো ভাল হিন্দু, ভাল বৌদ্ধ, ভাল জৈন, ভাল মুসলমান, ভাল খৃষ্ঠান হওয়া যায়। যদি ভাল মানুষই হতে পারা না যায়, তাহলে বৌদ্ধ হয়ে থাকলে কি হবে? হিন্দু, জৈন, খৃষ্ঠান, মুসলমান হয়ে থাকলেই বা কি হবে?

ধর্মের এই শুদ্ধতাকে উপলব্ধি করুনএবং ধারণ করুন। আমাদের সকলের জীবনে শুদ্ধ ধর্ম জাগ্রত হোক। সারবিহীন সংস্কাররূপ খোলসের অসারত্ববোধ হোক, উন্মূলন হোক। শুদ্ধ ধর্ম জীবনের অঙ্গ হয়ে থাক। এতেই আমাদের প্রকৃত কল্যাণ প্রকৃত মঙ্গল নিহিত আছে।

২· শুদ্ধ ধর্ম

দীর্ঘ পরম্পরার ফলে বর্তমানে ধর্মের নামে যে ছাল-বাকল অবশিষ্ঠ আছে (অর্থাৎ ধর্মের আসল রূপটা হারিয়ে গেছে; শুধু খোলসটাই অবশিষ্ট আছে মাত্র) তা থেকে মুক্তি নিয়ে শুদ্ধ ধর্মের সার গ্রহন করার চেষ্টা আমাদের করতে হবে। ধর্মের সারই মঙ্গলদায়ক এবং সার্থক। কেবল খোলস নিরর্থক এবং হানিকর। সার প্রাপ্ত হলেই সত্যিকার সুখ পাওয়া যায়।

শুদ্ধ ধর্মের সার হচ্ছে **শীল**, সদাচার। কায়িক এবং বাচিক দুষ্কর্ম থেকে বাঁচতে হবে। কায় এবং বাক দুষ্কর্মে লেগে থাকলে মনের গ্লানি এবং বিকার বাড়বেই। কারণ কায়িক এবং বাচিক সকল দুষ্কর্ম কলুষমুক্ত মনের দ্বারাই সম্পন্ন হয়। চিত্ত দূষিত না হলে হিংসা, চুরি, ব্যভিচার, অসত্য অথবা মিথ্যা ভাষণ, অথবা নেশাদ্রব্য সেবন কর্ম সংঘটিত হতে পারে না। কায় এবং বাক্-এর দুষ্কর্মের দ্বারা মনের মালিন্য বেড়েই যায়, কমে না। মনের সমস্ত প্রকার মালিন্য আমাদের দুঃখীই করে, সুখী করে না।

শুদ্ধ ধর্মের সার হচ্ছে **সমাধি**। কোন কল্পনাবিহীন যথার্থ অবলম্বনের সাহায্যে চিত্তকে একাগ্র করার নামই সমাধি। যেমন একাগ্রতা বিহীন চিত্ত মলিন থাকে, তদ্রুপ কল্পনা বা কামনার আধারে একাগ্র হওয়া চিত্তও মলিন। মলিন চিত্ত আমাদের দুঃখই দেয়, সুখ দেয় না।

শুদ্ধ ধর্মের সার হচ্ছে প্রজ্ঞা। জীবন ব্যবহারে আগন্তুক সকল বাহ্য অবলম্বনে এবং নিজের ভেতরের মনোবৃত্তিগুলোকে যথাযথ যথাস্বভাব জানতে থাকা, সেগুলোর সঙ্গে তাদাত্ম্য স্থাপন না করে (অর্থাৎ সেগুলোর সঙ্গে নিজেকে একেবারে লীন করে না দিয়ে) তাতে অনাসক্ত থাকাই প্রজ্ঞা। রাগ, দ্বেষ, মোহ এবং তজ্জন্য আসক্তিসমূহই মনের মালিন্য। প্রজ্ঞা এই মালিন্য দূর করে। মালিন্য থাকলে আমাদের দুঃখই বাড়ে, সুখ হয় না।

শীল, সমাধি এবং প্রজ্ঞার অভ্যাসের প্রত্যেক পদক্ষেপ হচ্ছে শুদ্ধ ধর্মের অভ্যাসের পদক্ষেপ, ধর্মের সার গ্রহণ করার পদক্ষেপ, সত্যিকার সুখ লাভ করার পদক্ষেপ। যার দ্বারা আমাদের শীল প্রতিষ্ঠিত হয় না, শুদ্ধ সমাধি পুষ্ট হয় না এবং প্রজ্ঞা স্থির হয় না—সেই কর্মকে (নিঃসার পরম্পরা হেতু) যতই ধার্মিক কৃত্য বলা যাক না কেন, বস্তুত তা সত্য ধর্ম থেকে, সার তত্ত্ব থেকে দূরে নিয়ে যাওয়ারই পদক্ষেপ। এইরূপ সকল নিরর্থক বাহ্যাচার, মিথ্যা কর্মকাণ্ড, নিষ্প্রাণ সংস্কার, দম্ভপূর্ণ দেখনাই, আড়ম্বরপূর্ণ বেশভূষা, উচ্চ জাতিতে জন্ম নেওয়া অথবা ধনবান হওয়ার মিথ্যা অহংভাব—সবই কেবল নিঃসার এবং নিঃসার। দুঃখ এবং দুঃখ। নিজের জন্যও বটে, অন্যদের জন্যও বটে।

সেজন্য, ধর্মের সারকেই গ্রহণ করুন, নিঃসার ত্যাগ করুন। নিজের এবং অন্যদের সুখের জন্য, কল্যাণের জন্য।

৩· ধর্মের সার

ধর্ম ঠিকভাবে উপলব্ধ হলেই তাকে ঠিকভাবে পালন করা যায়। ধর্মের সারকে বোঝার চেষ্টা করুন। সারকে বুঝতে পারলে তবেই তাকে গ্রহণ করতে পারবেন, অন্যথা ভিতরের সার বস্তুকে বাদ দিয়ে কেবল খোলসটাকে নিয়ে পড়ে থাকতে হবে। সেজন্য সারকে জেনেই ধর্ম মানতে শুরু করতে হবে।

সার বস্তুতে সর্বদা সমানত্ব থাকে। ভিন্ন ভিন্ন খোলসই বিভিন্নতার কারণ, এবং যেখানে এই খোলসগুলোকেই ধর্ম বলে মনে হরা হয়, সেখানেই ভিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। এটা হিন্দুদের ধর্ম—হিন্দুদের মধ্যেই আবার সনাতনী আছে, আর্য সমাজী আছে। এটা বৌদ্ধদের ধর্ম—বৌদ্ধদের মধ্যেই আবার মহাযানী, হীনযানী। এটা জৈনদের ধর্ম—জৈন্যদের মধ্যেই আবার দিগম্বরী, শ্বেতাম্বরী। এটা খৃষ্টানদের ধর্ম—খৃষ্টানদের মধ্যেই আবার ক্যাথলিক এবং প্রোটেষ্টেন্ট। এটা মুসলামানদের ধর্ম—মুসলামানদের মধ্যেই আবার শিয়া, সুন্নী প্রভৃতি। কেবল ভিন্ন ভিন্ন নহে, পরস্পর বিরোধীও। নিঃসার খোলসগুলোকে গুরুত্ব দেবার কারণেই এইসব বিভিন্নতা এবং এদের নিয়েই পারস্পরিক বিরোধ উৎপন্ন হয়।

কেউ রাখে টিকি কেউ বা রাখে দাড়ি। টিকি মোটা না পাতলা? দাড়ি মোচযুক্ত, না মোচবিহীন? কেউ রাখে মাথায় লম্বা চুল—চুল বেশ পরিপাটি করে সাজানো। কারও বা রুক্ষ-শুকনো চুল জটা-জটিল? কেউ মাথা নেড়া করে— কেউ বা ক্ষুর দিয়ে কেউ বা চিমটি দিয়ে? কেউ বা কান ছেদা করে— তাতে পড়ে কুণ্ডল বা মুদ্রা? কেউ বা লাগায় তিলক— কেউ বা চন্দনের, কেউ বা সিন্দুরের, কেউ এই রকমের, কেউ বা অন্য রকমের? কেউ বা পড়ে মালা—রুদ্রাক্ষের, বা চন্দনের বা তুলসীর? মাঝখানে লকেটযুক্ত না লকেটবিহীন? যদি লকেট থাকে, তাহলে তাতে কোন দেবী, দেবতা, গুরু, বা আচার্যের চিত্র বা চিহ্ন থাকবে? কেউ বা সবস্ত্র, কেউ বা নির্বস্ত্র? কাপড় পড়লে ধোলাই করা না ধোলাই না করা? এই রঙের না ঐ রঙের? এই রকম ঢঙের না ওরকম ঢঙের? ধুতি না লুঙ্গী? পাজামা না পাতলুন? কামিজ না কুর্তা? চাপকান না কোট? দুপল্লী টুপি, না তুর্কী বা ইংরেজী টুপি? কেউ বা গলায় না বাহুতে বা কব্জিতে বা পায়ে বা হাতের আঙুলে সুতো বাঁধে, কেউ বা যন্ত্র, তাবিজ বা কবচ? তাতে সংখ্যা থাকবে না অক্ষর? না শব্দ? না মন্ত্র? না তন্ত্র? না যন্ত্র? কেউ বা হাতে নেয় পাত্র, কেউ বা হাতকেই পাত্ররূপে ব্যবহার করে? পাত্র নিলে সেটা কি মাটীর? কাঠের? লোহার? না অন্য কোন ধাতুর?

এই যে ভিন্ন ভিন্ন রূপ-রূপকার, ভিন্ন ভিন্ন বাহ্যাড়ম্বর, বেশভূষা, আ কার প্রকার, সাজ-সজ্জা,—ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতীকমাত্র নহে, বরং এগুলো ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের নাম দিয়ে পারস্পরিক কারণে পর্যবসিত হয়েছে। কবে কোন এক ধর্মনেতা তৃষ্ণার্ত জনতাকে অমৃতরূপ ধর্মরস প্রদান করেছেন। কিন্তু যে পাত্রে

দিয়েছেন সেই পাত্রই আমাদের কাছে প্রমুখ বা প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে। কালান্তরে যখন সেই পাত্র জীর্ণ হোল তখন তাতে ছিদ্র হয়ে সমস্ত ধর্মরস বেরিয়ে গেল। জীর্ণ পাত্রটাই শুধু আমাদের কাছে রয়ে গেল। এই পাত্রের ধর্মরসকে আমরা কখনও জানলাম না, চোখেও দেখলাম না। অতএব, এই জীর্ণ পাত্রটাই আমাদের কাছে ধর্মের রূপ নিয়েছে, এবং তাকেই বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরে আমরা জীবনের সার্থকতা প্রতিপাদন করছি।

যেমন ভিন্ন-ভিন্ন রূপ সজ্জা তেমনি ভিন্ন ভিন্ন জড়, নির্জীব, নিষ্প্রাণ কর্মকাণ্ড আমাদের জন্য ধর্ম হয়ে গেছে এবং সেটাই আমাদের ঘাড়ে চেপে বসে আছে। শুদ্ধ ধর্ম অন্তর্হিত হয়েছে—আর আমরা চুল্লী, চৌকীকে, কাঁচা আর সিদ্ধ তরকারীকে, জাত-পাতকে, ছুয়া-ছুঁৎকে, এই বা ঐ নদী, পুকুর বা সমুদ্রে স্নানকে, এই বা সেই তীর্থে যাত্রা করাকেই ধর্ম বলে মানতে শুরু করেছি। এই বা সেই মন্দির, মসজিদ, গীর্জা, চৈত্য, উপাশ্রয় বা গুরুদ্বারে সকাল-সন্ধ্যা হাজিরা দেওয়াকেই ধর্ম বলে মানতে সুরু করেছি। পূর্ব বা পশ্চিম দিকে মুখ করে, দাঁড়িয়ে বা বসে, হাঁটু ভেঙে বা ভদ্রাসনে বসে হাত জোর করে বা অঙ্গুলি প্রসারিত করে, পঞ্চাঙ্গ, অষ্টাঙ্গ বা দণ্ডবৎ প্রণাম করে, এই বা সেই দেবী, দেবতা, গুরু, আচার্য বা ধর্মনেতার ছবি, মূর্তি, চরণচিহ্ন, পাদপীঠ বা ধাতু-অবশেষ অথবা তাঁর উপদেশ-গ্রন্থের সামনে বন্দনা করা, মাথা নত করা, দীপ জ্বালা, নৈবেদ্য চড়ানো, আবৃত্তি করা, শাঁখ বাজানো, নাচা, গাওয়া, আজান দেওয়া, স্তোত্র পাঠ করা, তাঁর নামে মালা জপ করা অথবা তাঁর বাণী পাঠ করাকেই ধর্ম বলে মানতে সুরু করেছি। এই প্রকারে ভয়ভীত চিত্তে কারও মানত করা, প্রসাদ চড়ানো, জাত-জড়ুলা, যাদু-টোনা অথবা ঝাড়-ফুঁক করাকেই ধর্ম বলে মানছি। কোন অজ্ঞাত অদৃশ্য সত্তাকে সন্তুষ্ট ও প্রসন্ন করার জন্য মুর্গী, ছাগল, গরু, মোষ এমনকি মানুষ পর্যন্ত বলি দান দিয়ে থাকি—এবং এটাকেই ধর্ম বলে মানছি। কেউ বলি দেবার সময় এক কোপে নিমেষের মধ্যে ধড় আর মাথা আলাদা করাকে, কেউ বা আস্তে আস্তে যন্ত্রণা দিয়ে দিয়ে প্রাণীকে হত্যা করাকেই ধর্ম বলে মানে। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন কর্মকাণ্ডযুক্ত ধর্ম বাজারে বিক্রী সুরু হয়েছে। আমরা ইচ্ছে করলে পয়সার জোরে এই ধর্মকে কিনে নিতে পারি। যে কর্মকাণ্ড স্বয়ং করা যায় না তাকে ভাড়া করা লোক দিয়ে করানো যায়। বাস্তবিক, এটাই হচ্ছে সত্য ধর্মের ঘোর অবমূল্যায়ণ—ধর্মের নামে ঘোর অধর্ম।

সত্যধর্মের উপলব্ধির জন্য আমরা যে সাধন পেয়েছি, আমাদের না বুঝার কারণে সেটাই আমাদের জন্য বন্ধন হয়ে গেছে। কোন মহাপুরুষ আমাদেরকে অন্ধকারে চলতে দেখে একটা জ্বলন্ত মশাল আমাদের হাতে ধড়িয়ে দিয়েছেন যাতে আমরা তার আলোকে ঠিক রাস্তায় চলে নিজের জীবনযাত্রাকে কুশলতার সহিত পূর্ণ করতে পারি। কিন্তু কালান্তরে সেই মশালের জ্যোতি নিভে গেছে। আমাদের হাতে কেবল মশালের দণ্ডটাই ধরা আছে। আর আমরা মূঢ়তাবশতঃ

দণ্ডটাকেই মশাল মনে করে বুঁদ হয়ে আছি। শিব চলে গেছে শব পড়ে আছে। মিথ্যা বাহ্যাচারই আমাদের জন্য ধর্ম হয়ে গেছে। এরূপ করুণ অবস্থায় আকণ্ঠ ডুবে যাওয়াতেই জনৈক প্রবাসী ভারতীয় বলেছেন—

"আমি বার্মায় এসেছি চল্লিশ বছর হয়ে গেছে। এখানে এসে আমি কত চুরি করেছি, ছল-কপটতা করেছি, ব্যভিচার করেছি, নেশা পান করেছি— কিন্তু নিজের ধর্মকে ছাড়িনি।"

"সেটা কিরকম ব্যাপার?"

জিজ্ঞেস করতে অতি সহজভাবে তিনি বললেন—"এই চল্লিশ বছর ধরে আমি কখনও কারও হাতে ছোঁয়া জল পান করিনি।"—হায়, আমরা বেচারী ধর্মকে কি করুণ অবস্থায় এনে ফেলেছি!

কখনও কখনও এরূপ হয় যে, এই বাহ্যাচার এবং বাহ্যাড়ম্বররূপী স্থূল খোলসগুলোকে তো আমরা ধর্ম বলে মানছিনা, বরং এইগুলোর জায়গায় এমন সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম খোলসগুলোকে ধর্ম বলে মানতে সুরু করেছি যে সেগুলো ভ্রান্তিকর এবং বেশী কঠিন বন্ধনযুক্ত হয়ে পড়েছে। যখন আমরা কোন অন্ধ সংস্কার, অন্ধ ভাবাবেশ অথবা বৌদ্ধিক তর্কজালকে ধর্ম বলে মানতে সুরু করি, তখন তাতে অধিকতরভাবে আবিষ্ট হয়ে পড়ি। যে পরিবারে আমরা জন্মেছি, যে পরিবেশে পালিত হয়েছি, সেই বংশ পরম্পরার কোন সংস্কার সম্বন্ধে বারবার শুনতে থাকি। অতএব সেই সংস্কারের ছাপ বারবার মনে পড়তে পড়তে এমন গভীর হয়ে যায় যে তাকে ছেড়ে অন্য কোন সংস্কার যতই খাঁটি হোক না কেন তাকে স্বীকার করে নেওয়ার মতো মনে জোর আমাদের থাকে না। আমরা যে দার্শনিক পরম্পরাকে মেনে চলি, তার সঙ্গে আমাদের এক ভাবনাত্মক সম্বন্ধ জুড়ে যায়। ফলস্বরূপ তার বিপরীত অন্য কোন দৃষ্টিকোণকে কখনও স্বীকারই করতে পারি না। অথবা এটাও হয় যে, নিজের তর্কবুদ্ধি বলে আমরা কোন সংস্কারকে স্বকীয় বলে গ্রহণ করে নিই, তাহলে নিজের বুদ্ধিবলকে অত্যধিক প্রাধান্য দেওয়ার স্বভাববশত অন্য কোন সংস্কারকে যথার্থ বলে মানতে প্রস্তুত নই। পরম্পরাগত সংস্কার, হৃদয়গত ভাবকতা অথবা বৌদ্ধিক তর্কজালের কারণে যখন আমরা কোন সংস্কারের দাস হয়ে যাই, তাহলে তার প্রতি এমন গভীর আসক্তি উৎপন্ন করে ফেলি যে, চিরদিনের জন্য তারই রঙের চশমা পড়ে ফেলি। অতএব ঐ রঙের অতিরিক্ত অন্য কোন রঙ আমরা দেখতে পাই না। এইভাবে যথার্থই আমরা শুদ্ধ ধর্ম থেকে অনেক দূরে সরে যাই। কারণ সকল কথাকেই নিজেরই চশমার রঙে বিচার করার আদত আমাদের হয়ে যায়।

ধরুন, অন্ধবিশ্বাস, অথবা বৌদ্ধিক কর্মজালের আকারে আমরা কোন সিদ্ধান্তকে স্বীকার করে রেখেছি, কিন্তু তার প্রতি জাত আসক্তির কারণে ঐ সিদ্ধান্তকে স্বীকার করার উপরই কেবল জোর দিয়ে থাকি। সেটার ব্যাবহারিক দিকটাকে সর্বতোভাবে ভুলে যাই। কোন সিদ্ধান্তকে কেবল স্বীকার করে নিলে কি ফল

পাওয়া যায়? মুখ্য কথা হচ্ছে, যদি সেই সিদ্ধান্ত যথার্থই হয় তাহলে জীবনে তার প্রয়োগ চাই। যেটা জীবনে প্রযুক্ত হয় সেটাই যথার্থ ধর্ম, অন্যথা নিঃসার ভাবুকতা মাত্র, জড় বুদ্ধিবিলাস মাত্র।

সৈদ্ধান্তিক স্তরে আমরা আত্মবাদী না অনাত্মবাদী, ঈশ্বরবাদী না নিরীশ্বরবাদী, দ্বৈতবাদী না অদ্বৈতবাদী, এতগুলো তত্ত্বের সংখ্যা গণনাকারী না ততগুলো তত্ত্বের সংখ্যা গণনাকারী, এই এই তত্ত্বের এই এই ব্যাখ্যাকারী, না ঐ ঐ ব্যাখ্যাকারী—এতে কিই বা এসে যায়? আসল কথা হোল, ব্যাবহারিক জগতে আমরা শুদ্ধ চিত্তের জীবন যাপন করছি কি না। নিজেকে যিনি ঈশ্বরবাদী বলে জাহির করেন, তাঁকেও দেখা যায় আগামী কালের চিন্তায় কত ব্যাকুল। যিনি নিজেকে অনাত্মবাদী বলেন, তাঁকেও দেখা যায় নিজের 'অহং'ভাবে কতটা ডুবে আছেন। অতএব, এই অবস্থাতে গোঁড়া সৈদ্ধান্তিক পক্ষ নিয়ে কী লাভ? মুখ্য কথা হচ্ছে—ব্যাবহারিক পক্ষের, আচরণের। শুদ্ধচিত্তের যে আচরণ তাই ধর্ম। কোন বিশেষ বেশভূষা ধারণ করুন বা না করুন, কোন বিশেষ কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করুন বা না করুন, কোন বিশেষ দার্শনিক মান্যতাকে মানুন বা না মানুন,—সেটা আসল ব্যাপার নয়। কিন্তু যদি আমাদের মন-মানস দ্বেষ-দৌর্মনস্যতাতে পূর্ণ থাকে, তাহলে আমরা সর্বথাই ধর্মহীন বলে জানতে হবে। আর যদি আমাদের মন-মানস স্নেহ-সৌমনস্যতাতে পূর্ণ থাকে, তাহলেই আমরা ধার্মিক বলে জানতে হবে। কোন বেশভূষা, কোন কর্মকাণ্ড, কোন দার্শনিক মান্যতা যদি আমাদের চিত্তবিশুদ্ধির পক্ষে সহায়ক হয়, তাকে অবশ্যই গ্রহণ করবো, আর যদি আমাদের চিত্তশুদ্ধির সঙ্গে সেগুলোর কোন সম্বন্ধই না থাকে তাহলে সেগুলো অবশ্যই নিরর্থক এবং বর্জনীয়। আবার সেগুলো যদি আমাদের ধার্মিক বানাবার মিথ্যা ভ্রান্তি উৎপাদনকারী হয়ে থাকে, তাহলে তাকে বিষধর সাপের মতো ভয়ংকর বলে মনে করতে হবে। অতএব, সর্বথা তাকে পরিত্যাগ করতে হবে। যদি আমরা ধর্মের সত্যসার বুঝতে না পারি, তার অর্থ হোল নিজের মধ্যে ভয়ংকর বিষধর সাপ-বিছাকে পুষে রাখার মতোই। মিথ্যা ভ্রান্তিতে অন্ধ হয়ে আমরা কতকগুলো তুচ্ছ কুসংস্কারকে বুকের মধ্যে সযত্নে পুষে বলে থাকি—এটাই আমার ধর্ম, এটাই আমার অমূল্যরত্ন, এটাই আমার মণি।

যতদিন পর্যন্ত না ধর্মের বাস্তবিক মণি লাভ করা যায়, ততদিন আমরা রিক্ত। আমাদের জীবন নিঃসার কারণ সেটা নিরর্থক কর্মকাণ্ড এবং নিষ্কর্মা বুদ্ধিবিলাসে পূর্ণ থাকে। কিন্তু তা হলেও, যদি আমরা এই বাস্তব সত্যকে উপলব্ধি করতে পারি যে—এগুলো নিছক সারহীন খোলসমাত্র এবং ধর্মের সার তো চিত্তের শুদ্ধতার মধ্যে; রাগ, দ্বেষ, মোহের বন্ধন থেকে মুক্তিতে; বিষম স্থিতির মধ্যেও অর্থাৎ প্রতিকূল পরিবেশেও চিত্তের সমতা বজায় রাখার মধ্যে; মৈত্রী, করুণা, মুদিতার মধ্যেই নিহিত; শুধু তাই নয় যদি আমরা সঙ্গে এটাও বুঝতে পারি যে এ সকল গুণ আমাদের মধ্যে নেই—তবে দেরীতে হলেও

ধর্মের সার আমরা একদিন লাভ করতে পারবো। কিন্তু যদি আমরা ঐসব নিঃসার খোলসগুলোকেই ধর্ম বলে মানতে সুরু করি তাহলে শুদ্ধ ধর্মকে লাভ করার সমস্ত সম্ভাবনারই পরিসমাপ্তি ঘটবে। আমরা বাইরের খোলসগুলোতেই রমিত হয়ে কখনও ভিতরের দিকে দৃষ্টিপাত করিনা, আত্মনিরীক্ষণ করি না। এটা আমরা কখনও পরীক্ষা করে দেখিনা যে, যে ধর্মকে আমরা পালন করছি তার মাধ্যমে আমাদের মন-মানসে কি পরিবর্তন সংঘটিত হচ্ছে।

জন্ম-মৃত্যু থেকে মুক্তির জন্য হাজার রকম চর্চা করবো, হাজার আশা বাঁধবো, কিন্তু বর্তমান জীবনে বিকারগুলো থেকে মনকে মুক্ত করার জন্য একটুও প্রযত্ন করবো না? ধর্মের সারবস্তু হারিয়ে গেলে যতটা ক্ষতি হয়, তার চেয়ে কয়েকগুণ বেশী ক্ষতি হয় যদি আমরা নিঃসারকে সার মনে করে তারই চাপে পড়ে যাই। এর ফলে রোগ আরোগ্যের বাইরে চলে যায়।

ধর্মের শুদ্ধতাকে জানা, বোঝা, পরীক্ষা করা, রোগমুক্তির সর্বপ্রথম আবশ্যক পদক্ষেপ। শুদ্ধ ধর্ম সর্বদাই স্পষ্ট এবং সুবোধ হয়ে থাকে। তাতে রহস্যময়ী সমস্যা থাকে না। সেখানে কোন প্রহেলিকা থাকে না। মানসিক ব্যায়াম থাকে না। প্রতীক এবং অতিশয়োক্তিতে ভরা পাণ্ডিত্য-প্রদর্শন থাকে না। যা কিছু হয় তা সহজই হয়। ধর্মের শুদ্ধতা এতেই আছে যে তাতে অনুমানের অবকাশ এবং কপোল কল্পনা থাকে না। যা কিছু হয়, তা যথার্থই হয়। সিদ্ধান্ত নিরূপণ ধর্ম নয়। স্বয়ং সাক্ষাৎকার, স্বয়ং অনুভব করার জন্যই ধর্ম। ধর্ম রাজপথের ন্যায় ঋজু। তাতে অন্ধগলি থাকে না যেগুলো মানুষকে বিভ্রান্ত করে। ধর্ম আদি, মধ্য, অন্ত-সকল অবস্থাতেই কল্যাণকারী হয়। ধর্ম সর্বসাধারণের জন্য সমানভাবে গ্রহণযোগ্য হয়। এরূপ হলেই ধর্ম যথার্থ, শুক্ল এবং শুদ্ধ। অন্যথা ধর্মের নামে কোন ধোকাই হতে পারে।

শুদ্ধ ধর্ম কি?

বাক্‌কর্ম, কায়কর্ম, জীবিকা, মানসিক সুস্থতার অভ্যাস, স্মৃতিমান থাকায় অভ্যাস, একাগ্রতার অভ্যাস যদি শুদ্ধ হয়, মানসিক চিন্তন এবং জীবন জগতের প্রতি দৃষ্টিকোণ যদি শুদ্ধ হয়—তাই শুদ্ধ ধর্ম।

মোটামুটি ভাবে বলতে গেলে—

(১) দান—অহংকারবিহীন নিঃস্বার্থভাবে প্রদত্ত দান—শুদ্ধ ধর্ম।

(২)শীল—সদাচার পালন করা, হিংসা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যাভাষণ এবং নেশা সেবন থেকে বিরতি—শুদ্ধ ধর্ম।

(৩) সমাধি—মনকে বশীভূত করা, তাকে একাগ্র করে বর্তমানের প্রতি সজাগ থাকার অভ্যাস—শুদ্ধ ধর্ম।

(৪) প্রজ্ঞা—'আমি' 'আমার' অথবা প্রিয়-অপ্রিয় মূলক রাগদ্বেষ থেকে বিরত থেকে প্রত্যেক ব্যক্তি, বস্তু এবং স্থিতিকে যথাভূত প্রজ্ঞাপূর্বক দেখার অভ্যাস, চিত্তের সমতার অভ্যাস—শুদ্ধ ধর্ম।

দান, শীল, সমাধি এবং প্রজ্ঞার অভ্যাস সার্বজনীন, সাম্প্রদায়িকতাবিহীন, সর্বজনহিতকারী এবং সর্বজনগ্রাহ্য। এতেই নিহিত আছে শুদ্ধ ধর্মের বীজ। কিন্তু এই শুদ্ধ ধর্মের অভ্যাস না করে, যদি বলতে চাই যে আমি ধার্মিক, এর চেয়েও বেশী যদি চাই যে লোকে আমাকে ধার্মিক বলে মানুক—তাহলে ধর্মের নামে বিজ্ঞাপনবাজী করা হয় না কি? আমরা নানা প্রকার বাহ্যাচার করি, নানাপ্রকার দার্শনিক বাদ-বিবাদ করি। বাক্‌বিলাস আর বুদ্ধিবিলাস করি, আর এইভাবে আত্মপ্রবঞ্চনার জঞ্জালে পড়ে আমরা হাবুডুবু খাই। এতে না আত্মহিত সাধিত হয়, না পরহিত?

আত্মহিত এবং পরহিতের জন্য শুদ্ধ ধর্মের জীবন যাপন অনিবার্য। শুদ্ধ ধর্মের জীবন যাপনের জন্য ধর্মের শুদ্ধতাকে জানা অনিবার্য। ভুষি থেকে ধানকে খোলস থেকে সারকে আলাদা করা অনিবার্য। সারকে গুরুত্ব দিতে শিখলেই সার গ্রহণ করা সম্ভব হবে।

শুদ্ধ ধর্মের সার গ্রহণ করলে দ্বেষ, মোহ, দৌর্মনস্য, দুরাগ্রহ, অভিনিবেশ, হঠকারিতা, পক্ষপাত-সংকীর্ণতা, গোঁড়ামি, ভয়, আশঙ্কা, অবিশ্বাস, আলস্য, প্রমাদ ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ জীবন নিস্তেজ, নিষ্প্রাণ, নিরুৎসাহীই হবে। কুৎসিত, কলুষিত, কুটিলই হবে, ব্যাকুল, ব্যথিত, ব্যগ্রই হবে। শুদ্ধ ধর্মের সার গ্রহণ করতে পারলে ভালবাসা এবং করুণা, স্নেহ এবং সদ্‌ভাব, ত্যাগ এবং বলিদান, সহযোগ এবং সহকার, শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস, অভ্যুদয় এবং বিকাশে পরিপূর্ণ জীবন ওজস্বী, তেজস্বী, বলিষ্ঠ হবে; উদাত্ত, অভয়, নিশ্চিন্ত হবে; সহজ, সরল, স্বচ্ছ হবে; মঙ্গল, কল্যাণ, স্বস্তিতে ভরপুর হবে।

শুদ্ধ ধর্মের এটাই প্রত্যক্ষ লাভ। প্রত্যক্ষ লাভই শুদ্ধ ধর্মকে যাচাই করার যথার্থ কষ্টিপাথর।

৪· ধর্ম ধারণ

ধর্ম ধারণ করাতেই যথার্থ কল্যাণ হয়।

ধর্মচর্চা কখনও লাভপ্রদ হতে পারে, কখনও বা লাভপ্রদ হয় না, কখনও হানিপ্রদ হতে পারে।

ধর্মচিন্তা কখনও লাভপ্রদ হতে পারে, কখনও বা লাভপ্রদ হয় না, কখনও বা হানিপ্রদ হতে পারে।

কিন্তু ধর্ম ধারণ করলে তা সর্বদাই লাভপ্রদ হয়।

ধর্মচর্চা করে ধর্ম সম্বন্ধে শ্রুত-জ্ঞান লাভ করা যায়। ইহাই আমাদের প্রেরণা এবং মার্গদর্শন প্রদান করে এবং ফলত যদি আমরা ধর্ম ধারণ করি তাহলে ধর্মচর্চা আমাদের লাভেরই কারণ হয়ে থাকে। কিন্তু যখন এর দ্বারা আমরা কেবল বুদ্ধিবিলাসই করে থাকি তাহলে ধর্মচর্চা আমাদের জন্য লাভপ্রদ হতে পারে না। যখন এই শ্রুত-জ্ঞান আমাদের মধ্যে জ্ঞানী হবার মিথ্যা দম্ভ উৎপাদন করে তাহলে ধর্মচর্চা আমাদের হানিরই কারণ হয়ে থাকে।

ধর্মচিন্তন সম্বন্ধেও একই কথাই প্রযোজ্য। ধর্মের চিন্তন-মনন বৌদ্ধিক জ্ঞান উৎপাদন করে নিরর্থক বুদ্ধিবিলাসের কারণ হয়ে থাকে। অথবা মিথ্যা দম্ভ উৎপাদন করে হানির কারণ হয়ে থাকে। কিন্তু যখন এই চিন্তন-জ্ঞান ধর্ম ধারণ করার প্রেরণা যোগায়, মার্গদর্শন প্রদান করে এবং ফলত আমরা ধর্ম ধারণ করি, তাহলে তা কল্যাণেরই কারণ হয়ে থাকে।

বাস্তবিক কল্যাণ তো ধর্ম ধারণ করার মধ্যেই নিহিত আছে, মিথ্যা বুদ্ধি-বিলাসে নয়, মিথ্যা দম্ভে নয়।

অতএব সাধকগণ আসুন! ধর্মকে ধারণ করুন। ধর্মকে ধারণ করে নিজে শীলবান হোন, সমাধিবান হোন, প্রজ্ঞাবান হোন। এটাই মঙ্গলের উৎস।

৫· বুদ্ধি-বিলাস ধর্ম নহে

চিন্তন-মনন দ্বারা ধর্মের সিদ্ধান্তকে জানলেই আমাদের প্রকৃত লাভ হয় না। রসগোল্লা মিষ্টি এটা শুধু জানলেই আমাদের মুখ মিষ্টি হয়ে যাবে না। তার জন্য রসগোল্লাকে জিভের উপর রাখতে হবে। দুধ পুষ্টিকারণ এটা শুধু জানলেই আমাদের দেহ পুষ্ট হয়ে যাবে না। দেহের পুষ্টির জন্য আমাদের দুধ পান করতেই হবে। জানাকে এবং বোঝাকে আমাদের কল্যাণের প্রথম সিঁড়ি বলা যেতে পারে। কিন্তু কেবল জেনে এবং বুঝে যদি থেমে যাই এবং যেটাকে জেনেছি এবং বুঝেছি তাকে জীবনে কাজে না লাগাই, তাহলে এই জানা এবং বোঝা ব্যর্থ হয়েই যাবে। শুধু বুদ্ধি-বিলাস এবং শুধু অহংকার কেবল কসরত করা মাত্র। আর আমরা তো এটাই করে থাকি।

ধার্মিক এবং দার্শনিক সিদ্ধান্ত সমূহের বাদ-বিবাদ, চর্চা-পরিচর্চা, খণ্ডন-মণ্ডন, তর্ক-বিতর্ক, ব্যঞ্জনা-বিশ্লেষণ, বোঝা-বোঝানো, শোনা-শোনানো, পড়া-পড়ানো, লেখা-লেখানো এবং বলা-বলানোতেই আমরা নিজেদের সারাজীবন কাটিয়ে ফেলি এবং এটাই দুর্ভাগ্য যে এতেই নিজেদের জীবনের সাফল্য বলে মনে করি।

নিজের ধর্মজিজ্ঞাসা পূর্ণ করা তথা বৌদ্ধিক স্তরে উপলব্ধ ধর্মজ্ঞানকে জটিল ভাষায় ব্যক্ত করার ক্ষমতা লাভ করার মধ্যেই আমাদের পরম তুষ্টি হয়ে থাকে। এই সন্তুষ্টিকেই আমরা জীবনের অন্তিম লক্ষ্য বলে মনে করি। বাস্তবিক, কি আকর্ষণীয় এই মায়াজাল যাতে আমরা এত সহজেই ফেঁসে যাই! আর আবার এই বন্ধনকেই ভূষণ মনে করে আমরা গর্ব অনুভব করি!

৬· ধর্মের যথার্থ মূল্যায়ণ

ধর্মের যথার্থ মূল্যাংকন করতে শিখুন। যদি সম্যক্ মূল্যাংকন করতে থাকেন তাহলে দুধ আর জলের পার্থক্য বিষয়ে বিবেক জাগ্রত থাকবে, ধর্মপথে চলার পক্ষে নিজের সঠিক মাপকাঠি বজায় রাখতে পারবেন। অন্যথা ধর্মের কোন এক অঙ্গ প্রয়োজনের অধিক গুরুত্ব পেয়ে ধর্ম শরীরের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিতে বাধা সৃষ্টি করবে। সম্যগ্‌দৃষ্টি হোল এটাই যে যার যতটা মূল্য তাকে ততটা গুরুত্ব দেয়া। বেশীও নয়, কমও নয়। কাঁক ড়, পাথর, কাঁচ, হীরা, মোতী, নীলকান্ত, মণি প্রত্যেকটিরই নিজ নিজ গুরুত্ব আছে। মাটী, লোহা, তামা, পিতল, রূপা, সোনা প্রত্যেকটির আলাদা-আলাদা মূল্য আছে। যার যতটা গুরুত্ব তার ততটাই মূল্য। বাস্তব ক্ষেত্রে কাঁচ আর হীরা, মাটী আর সোনার যেমন এক মূল্য হতে পারে না, তদ্রুপ ধর্মের ক্ষেত্রেও এরূপ মূল্যাংকন করতে শিখতে হবে। তা না হলে যেটা সারহীন খোলসমাত্র তাকেও ধর্ম বলে মেনে বসে থাকবেন অথবা ধর্মের কোন এক সাধারণ প্রাথমিক অবস্থাকেই সব কিছু মনে করে আর শুদ্ধ ধর্মের উচ্চতম অবস্থাতে কখনও পৌঁছুতে পারবেন না।

যেমন, দান করা ভাল। দান ধর্মেরই একটি অঙ্গ। কিন্তু ধর্মের কষ্টিপাথরের দানেরও পৃথক পৃথক মূল্যাংকন হওয়া দরকার। এই মূল্যাংকন বিত্তীয় নয় নৈতিক। দান বেশী বা কম এর কোন গুরুত্ব নেই। কিন্তু দান দেবার সময় চিত্তের চেতনা কিরূপ থাকে, তাতেই ধ্যান দিতে হবে। যদি সেই সময় চিত্তে ক্রোধ, অস্থিরতা, ঘৃণা, বিদ্বেষ, ভয় বা আতংক থাকে, অথবা বিনিময়ে কিছু পাবার তীব্র লালসা বা যশোলাভের প্রবল কামনা বা প্রতিস্পর্ধার উৎকট ভাব থাকে, তাহলে এই দান শুদ্ধ, নিষ্কাম, নিরহঙ্কার চিত্তে প্রদত্ত দান অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট। শুদ্ধ চিত্তে প্রদত্ত প্রদত্ত দানের অনেক গুরুত্ব আছে। এর দ্বারা নিষ্কাম ত্যাগধর্ম পুষ্ট হয়। আবার এর গুরুত্বের অতিরঞ্জনা করে একেই যদি সব কিছু বলে মেনে বসে থাকেন, তাহলে ধর্মের অন্যান্য অঙ্গের অবহেলা করা হবে এবং ফলত ধর্ম দুর্বল থেকে যাবে।

এইরূপ, উপবাসও ধর্মের একটা অঙ্গ। আমরা উপবাসের দ্বারা শরীরকে সুস্থ রাখি। সুস্থ শরীরেই ধর্মের সুগমতাপূর্বক পালন করা যায়। শারীরিক স্বাস্থ্য ছাড়াও মানসিক সংযমের জন্যও উপবাস উপযোগী। কিন্তু উপবাস করে যদি মন ভিন্ন ভিন্ন অকুশল বিষয়ে রমিত থাকে তাহলে এই উপবাসও অর্থহীন হয়ে যায়। আর যদি উপবাস করে কেবল শরীরকে নয়, মনকেও সংযত করা যায়, তাহলে সেই উপবাস হয় সার্থক। হীনমানের কথা ছেড়েই দিন, উচ্চমানের উপবাসকেও যদি অতিরঞ্জিত করে তাকেই সবকিছু বলে মেনে বসে থাকেন, তাহলে আপনি 'অহং'ভাবের শিকার হয়ে যাবেন এবং উপবাসের চেয়েও অধিক মহত্ত্বপূর্ণ ধর্মের অঙ্গসমূহ দুর্বল থেকে যাবে বা একেবারে অস্পৃষ্ট থেকে যাবে; সেগুলোর অভ্যাস করা তো দূরের কথা, সেগুলোকে পুষ্ট করার কথাও আমরা

কখনও ভাববো না।

উপবাসকারী শীল সদাচারবিহীন ব্যক্তি উপবাসকারী শীলবান ব্যক্তির চেয়ে হীন। এইরূপভাবে সামিষ ভোজনকারী অপেক্ষা নিরামিষ ভোজনকারী, তেল লংকা মসলা যুক্ত রাজসিক ভোজনকারী অপেক্ষা সাদাসিধে সাত্বিক ভোজনকারী ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ এবং উত্তম। তবে সাত্বিক নিরামিষ ভোজনকারী ব্যক্তি তাঁর ঐ গুণের জন্য নিজেকে যদি অন্যদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করতে সুরু করেন, তাহলে মিথ্যা 'অহং' এর কারণে শুদ্ধ ধর্মের উন্নতিপথ থেকে তিনি দূরে সরে যাবেন। ভোজনবিষয়ে মাত্রাজ্ঞ হওয়া এবং গুণজ্ঞ হওয়া— অর্থাৎ অতটুকু এবং ওরকম ভোজনই করতে হবে যতটুকু এবং যেরকম আমাদের শরীরের জন্য উপযোগী এবং আবশ্যক—এটাও ধর্মের ভাল অঙ্গ। কিন্তু তার চেয়েও ভাল এবং উত্তম অঙ্গ ধর্মের আছে—এটা না জানলে তা থেকে বঞ্চিত থেকে যেতে হবে।

যে ব্যক্তি নিজের অধিকাংশ সময় আলস্য এবং প্রমাদে এবং কাটান তাঁর অপেক্ষা যিনি যথাবশ্যক কম সময় শুয়ে অধিক থেকে অধিক সময় সজাগ থাকেন তিনি নিশ্চিতরূপে অধিক ভাল। কিন্তু—তদ্রুপ সজাগ ব্যক্তির এটা ভুললে চলবেনা যে তাঁকেও ধর্মপথের আগের অনেক কিছু লাভ করতে হবে।

টহল দেওয়া, দৌড়ানো, সাঁতার কাটা, ব্যায়াম করা এবং তদ্রুপ আসন প্রাণায়াম করা শরীরকে সুস্থ এবং প্রফুল্ল রাখার জন্য আবশ্যক এবং লাভদায়ক। তদ্রুপ রোজ স্নান করা, শরীরকে পরিচ্ছন্ন রাখা, পরিষ্কার কাপড় পড়া ভাল। স্বাস্থ্যরক্ষার ক্ষেত্রে এগুলোর নিজস্ব গুরুত্ব আছে, মূল্য আছে। কিন্তু কেবল এগুলোকেই ধর্ম বলে মেনে বসে থাকলে এবং ভেতরের (অর্থাৎ মনের) সাফাই বন্ধ রেখে কেবল বাইরের সাফাইতে লেগে থাকলে নিজেরই হানি হবে।

কেউ ব্রত পালন করেন এইজন্য যে মন যেন সংযত, সরল, সুদৃঢ় থাকে, এবং ধর্মমার্গে অবিচল থাকে। কিন্তু এই ব্রতগুলোকেও সবকিছু বলে মেনে বসে থাকলে এটাই তো বন্ধন হয়ে থাকবে। মনকে একাগ্র করার জন্য কেউ মালা জপ করে, কেউ মনে মনে কোন মন্ত্র জপ করে। কিন্তু মনকে একাগ্র করার জন্য একটুও অভ্যাস না করে কেবল যন্ত্রবৎ মালা এবং মন্ত্র জপ করার কর্মকেই ধর্ম বলে মেনে বসে থাকা ভণ্ডামি ছাড়া আর কিছু নয়।

কেউ মন্দিরে গিয়ে নিজের উপাস্য দেবতাকে দর্শন করেন। এতে তাঁর মনে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়। শ্রদ্ধা থেকে মনে সৌমনস্যতা জাগে। সৌমনস্যতা চিত্তকে একাগ্র করার পক্ষে সহায়ক হয়। নিজের উপাস্য দেবতার মূর্তি চোখ খুলে যেমন দেখা হয়, ঠিক তদ্রুপ চোখ বন্ধ করেও দেখার অভ্যাস করলে, বারবার ঐ মূর্তির ধ্যান করলে চোখের সামনেও অবিকল সেই মূর্তি দেখা যাবে। এই ভাবেও চিত্তকে একাগ্র করার অভ্যাস আয়ত্ত করা যায়। মূর্তির আকৃতির ধ্যান করতে করতে উপাস্য দেবতার গুনাবলীর ধ্যান করতে হবে এবং নিজের জীবনে ঐ গুণাবলী প্রয়োগ করার জন্য চেষ্টা করতে হবে। এটা বাস্তবিকই কল্যাণকারী।

কিন্তু আমরা তাতো করিনা। কেবল মন্দিরে গিয়ে মূর্তির সামনে যন্ত্রবৎ বারবার মাথা নত করাকেই ধর্ম বলে মনে করি। ধর্মের এইরূপ মিথ্যা মূল্যায়ণের কারণে আমরা কেবল সংস্কারেই জড়িয়ে থাকি।

এইরূপ, ভজন কীর্তন হচ্ছে তাতে লীন হওয়ার জন্যই—চিত্তকে একাগ্র করার জন্যই। কিন্তু এগুলো থেকে অধিক অন্য কিছুকে যদি মানতে সুরু করি, তাহলে আবার আমরা প্রতারণার মধ্যেই পড়ে যাবো। কোন গুরু বা সাধুর দর্শন তাঁর গুণাবলী অসুসরণ, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা উৎপন্ন করার জন্যই তাঁর গুণাবলী দেখে মনে প্রেরণা জাগাতে হবে এবং ঐ গুণাবলী স্বয়ং ধারণ করতে হবে। কিন্তু এর চেয়ে অধিক তাঁর মূল্যাংকন করা সুরু করলে আমরা বিবেক হারিয়ে ফেলি এবং অন্ধ শ্রদ্ধার ফলে বুদ্ধি জড় হতে সুরু করে। কেউ ধর্মগ্রন্থ পাঠ করেন অথবা শ্রবণ করেন—এইজন্যই যে তা থেকে যেন আমরা প্রেরণা পাই, মার্গ লাভ করি, যেন ধর্মজীবনে প্রবেশ করতে পারি। কিন্তু এটাভুলে গিয়ে কেবল শ্রবণ এবং পাঠকেই যদি আমরা সবকিছু বলে মনে করি তাহলে মিথ্যাদৃষ্টির চোরাবালিতে আমাদের জীবন-গাড়ীর চাকা আটকে যাবেই।

নতুন নতুন বাকচাতুর্য এবং বুদ্ধিবিলাস ধর্ম নয়। জীবনে প্রযুক্ত শীল সদাচারই ধর্ম। শীল-সদাচারেরও আলাদা শ্রেণী আছে। অহিংসা, অচৌর্য, ব্রহ্মচর্য, সত্যবাদিতা এবং অপ্রমাদ—এই শীলগুলোর মধ্যে কেউ একটা, কেউবা দুটো, কেউবা তিনটে, কেউবা চারটে, কেউবা পাঁচটা পালন করেন। কাজেই ক্রম অনুসারে একজনের চেয়ে আর একজন বেশী ধার্মিক। এর মধ্যেও আবার কিছু বক্তব্য আছে যে, কেউ কেউ শীল পালন করেন অনুকূল পরিবেশ পেয়েছেন বলেই অর্থাৎ শীল পালনের অনুকূল পরিবেশে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন, পালিত হয়েছেন এবং রয়েছেন। কিন্তু আবার কেউ কেউ আছেন যাঁরা প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে থেকেও শীল পালন করেন, মনকে নিজের বশে রাখেন। এই দুই শ্রেণীর ব্যক্তির মধ্যে প্রথম শ্রেণী অপেক্ষা দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ।

মনকে নিজের বশে রাখা ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। ইহাই সমাধি। কিন্তু কোন ব্যক্তি সমাধি হাসিল করার জন্য যে আলম্বনের প্রয়োগ করেন, সেটা যদি রাগ, দ্বেষ বা মোহবর্ধক হয়, তাহলে সে ব্যক্তি দূষিত চিত্ত নিয়েই সমাধিস্থ হন। আরযে ব্যক্তি এমন আলম্বন গ্রহণ করেন যা রাগ, দ্বেষ এবং মোহের ক্ষয়কারী, তাহলে সে ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম। দূষিত চিত্তের একাগ্রতার দ্বারা মনোবল প্রাপ্ত হয়েও কেউ কেউ অনেক ঋদ্ধি এবং সিদ্ধি হাসিল করে এবং এর সাহায্যে সাধারণ লোকদের চমকদার অনেক অদ্ভুত কিছু দেখাতে পারে। কিন্তু এজাতীয় ঋদ্ধি এবং সিদ্ধিকে ধর্ম বলেমেনে নেওয়া বিপজ্জনক। যিনি ঐ জাতীয় ঋদ্ধি-সিদ্ধি লাভ করেছেন তিনি ধর্মপরায়ণ হবেন বলে কথা নেই। অনেক দুঃশীল ব্যক্তিও ঋদ্ধি-সিদ্ধির প্রভাবে অনেক চমৎকারিত্ব প্রদর্শন করতে পারে। অতএব, চমৎকারিত্বের আধারের উপর ধর্মের মূল্যায়ণ করা যায় না।

করলেও সেই মূল্যায়ণ ভুল হবে। অতএব, সমাধির সঙ্গে শীলের ভূমিকাও অনিবার্য।

শুদ্ধ সমাধির মার্গেও বিভিন্ন উপলব্ধি হয়। কখনও আমরা একনাগাড়ে তিন ঘন্টা এক আসনে বসে থাকতে পারি। কিন্তু এরূপ আসন-সিদ্ধি সাধনার অন্তিম লক্ষ্য নয়। এই প্রকার একাগ্রতার অভ্যাসের সময় কখনও কখনও বন্ধ চোখের সামনে আমরা প্রকাশ, জ্যোতি, রূপ, রঙ্গ, আকৃতি সমূহ, দৃশ্য প্রভৃতি দেখতে পাই। কখনও কখনও কানে অপূর্ব শব্দ শুনতে পাই, নাকে অপূর্ব ঘ্রাণ আসে, জিভ দিয়ে অপূর্ব রস আস্বাদন করি, শরীর দিয়ে কোন অপূর্ব স্পর্শের অনুভব করি এবং এসকল ভিন্ন ভিন্ন অতীদ্রিয় অনুভূতিগুলোকে দিব্য জ্যোতি, দিব্য শব্দ, দিব্য গন্ধ, দিব্য রস এবং দিব্য স্পর্শ বলে মনে করে যদি এগুলোকে প্রয়োজনের বেশী গুরুত্ব দিতে সুরু করি তাহলে এই প্রকার সমাধির অভ্যাসকালীন কখনও কখনও শ্বাস সূক্ষ্ম হয়ে হয়ে অনায়াসে স্তব্দ হয়ে যায়। আপনা থেকেই 'কুম্ভক' হতে সুরু করে। অভ্যাস করতে করতে বিচার এবং বিতর্কের প্রবাহ মন্ধ হতে সুরু করে এবং কখনও কখনও নির্বিচার, নির্বিকল্প অবস্থা এসে যায়। একাগ্রতা বাড়তে থাকলে ভেতরে প্রীতি-প্রমোদ জাগে। আনন্দের লহড়ী উঠতে থাকে। মন এবং শরীর রোমাঞ্চ এবন পুলকে ভরে ওঠে। শরীর অনেক হাল্কা হয়ে যায়। কিন্তু এই ভিন্ন ভিন্ন প্রিয় অনুভূতিগুলোকেই সব কিছু বলে মনে করে যদি এইগুলোর অতিশয়োক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা করতে সুরু করি তাহলেও ভুল হবে। এই অনুভূতিগুলো লম্বা রাস্তার স্থানে স্থানে মাইল পোষ্টের মতো অর্থাৎ নির্দেশক চিহ্ন মাত্র। এগুলোর কোন একটিতে আসক্ত হয়ে পড়লে সেটাই বোঝা হয়ে দাঁড়াবে, প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে। এগিয়ে যাওয়া মুসকিল হবে। এই অনুভূতিগুলো যেন ধর্মশালা। এগুলোর কোন একটাকে অন্তিম লক্ষ্য মনে করে তাতেই যদি আসক্ত হয়ে পড়ি তাহলে আর সামনের পথে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। যাত্রা বন্ধ হয়ে যাবে। প্রথম ধ্যান থেকে অষ্টম ধ্যান পর্য্যন্ত সকল সমাধি (=সমাপত্তি) একটার চেয়ে একটা বেশী উন্নত। কিন্তু আটটি ধ্যানে পারঙ্গত হলেও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণতা লাভ করেছে বলে মেনে নেওয়া যায় না। আটটি সমাধি-সমাপত্তিতে সহজ অনুভূতি উৎপাদনকারী সাধকেরও প্রজ্ঞাবান হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

প্রজ্ঞাবান প্রজ্ঞাবানের মধ্যেও ভেদ আছে। কোন প্রজ্ঞাবান এমন যিনি শ্রুতময়ী প্রজ্ঞা আয়ত্ত করেছেন অর্থাৎ যিনি পড়াশুনা করে প্রজ্ঞার উপলব্ধিকারী হয়েছেন। দ্বিতীয় প্রজ্ঞাবান যিনি চিন্তাময়ী প্রজ্ঞা আয়ত্ব করেছেন অর্থাৎ যিনি পড়াশুনা করে প্রজ্ঞার উপলব্ধিকারী হয়েছেন। দ্বিতীয় প্রজ্ঞাবান যিনি চিন্তাময়ী প্রজ্ঞা আয়ত্ত করেছেন অর্থাৎ যিনি পড়াশুনার দ্বারা লব্ধ জ্ঞানকে চিন্তন-মনন দ্বারা বুদ্ধির কষ্টিপাথরে যাচাই করে যুক্তিসঙ্গত মনে করে তাকে স্বীকার করে নিয়েছেন। অতএব প্রথম শ্রেণীর প্রজ্ঞাবান অপেক্ষা দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রজ্ঞাবান উত্তম। কিন্তু এই দুই শ্রেণীর প্রজ্ঞাবান অপেক্ষা তৃতীয় শ্রেণীর প্রজ্ঞাবান উত্তম যিনি ভাবনাময়ী

প্রজ্ঞাকে আয়ত্ত করেছেন অর্থাৎ যিনি প্রত্যক্ষ অনুভূতিসমূহের বলে বলীয়ান হয়ে স্বয়ং নিজের প্রজ্ঞা উৎপাদন করেন।

আমরা নিজের ভাবনাময়ী প্রজ্ঞা জাগ্রত করেছি না পরায়ী প্রজ্ঞার বলে কেবল বুদ্ধিরঞ্জন করছি, ওটাকে স্বয়ং বিচার করে দেখতে হবে। প্রজ্ঞার নামে যদি কেবল বুদ্ধিরঞ্জনই হয়, তাহলে জীবনের বিষম পরিস্থিতিতে মন উত্তেজিত উদ্বেলিত হয়েই থাকবে। ভাবনাময়ী প্রজ্ঞার বলে যদি ব্যক্তি, বস্তু, স্থিতিকে যথাযথভাবে দেখি, এবং ওগুলোর গুণ-ধর্ম-স্বভাবকে যথাযথভাবে দেখি, তাহলে নিজের মনের ভারসাম্য নষ্ট হয় না। অন্তর্মনে সঞ্চিত দৌর্মনস্যের বিভিন্ন গ্রন্থিগুলো নিজে নিজে খুলতে আরম্ভ করে। চিত্তের কলুষ দূর হয়ে যায়। তাতে নির্মলতা আসে। নির্মলতা এলেই—সংকীর্ণতার স্থানে উদারতা, দুর্ভাবনার স্থানে সদ্‌ভাবনা, বিদ্বেষের স্থানে প্রেম, ঈর্ষ্যা স্থানে সন্তুষ্টি বা প্রমাদ, বৈরিতার স্থানে মৈত্রী উৎপন্ন হয়। এই সকল সদ্‌গুণ জীবনে আসে না কি? আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহারে সেগুলো প্রকট হয় না কি? এই মাপদণ্ডের দ্বারা ধর্মের ক্ষেত্রে আমরা নিজেদের উন্নতির পরিমাপ করতে পারি। যেরূপভাবে প্রজ্ঞায় স্থিত হতে থাকবেন, তদ্রুপভাবে শীল পুষ্ট এবং সমাধি সুদৃঢ় হতে থাকবে। মন বশে থাকতে সুরু করবে। সদাচারই জীবনের সহজ স্বভাব হয়ে যাবে। তার জন্য কোন বিশেষ প্রচেষ্টা করতে হবে না। নিজের অন্ধ স্বার্থের জন্য অন্যদের ক্ষতি করার সংকীর্ণ বুদ্ধি দূর হয়ে যাবে। নিজের সুখ-সাধন অন্যদের মধ্যে বন্টন করে দিয়ে অংশীদার করার মনোবৃত্তি সহজভাবেই জীবনের অঙ্গ হয়ে যাবে। এইভাবে যতই ধর্মের সর্বাঙ্গীণ পুষ্টি হবে ততই নানা আচার-অনুষ্ঠান, যা পূর্বে ধর্মের স্থান অধিকার করেছিল এবং যেগুলোকে না বুঝে নিজের পরমার্থ বলে মনে করে বুঁকে বেঁধে রাখা হয়েছিল, সাপের খোলস পাল্টানের মতো বিনা কষ্টে এবং বিনা প্রয়াসে আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যাবে। আর যে নতুন ত্বক উৎপন্ন হবে তা নিষ্প্রাণ নয়, বরং সজীব এবং একেবারে জীবন্ত।

ত্বকের নিজস্ব গুরুত্ব আছে। কিন্তু নিষ্প্রাণ হয়ে গেলেও তাকে ধারণ করে রাখাই হচ্ছে অজ্ঞানতা। খোলসেরও নিজস্ব গুরুত্ব আছে। কিন্তু তার উপযোগিতা ফুরিয়ে গেলেও মোহবশে তাকে ধারণ করে রাখাটা অজ্ঞানতা। শুদ্ধ প্রজ্ঞা পুষ্ট হলে সকল বস্তুর যথার্থ মূল্যাংকন হয়। সম্মোহনী তর্কজালের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কোন উপযোগী বস্তুকে নষ্ট করে দিই না এবং পরম্পরার প্রতি ভাবাবেশময়ী আসক্তিসমূহের কারণে কোন মূল্যহীন বস্তুকে গলায় জড়িয়ে রাখি না। পুষ্ট প্রজ্ঞার ফলে এমন বিশুদ্ধ বিবেক জাগে যার ফলে অসার তর্কজাল বা অন্ধ ভাবাবেশ টিকতে পারে না। ধর্মের প্রত্যেক অঙ্গের যথার্থ মূল্যাংকন হওয়ার দরুণ ধর্মের সর্বাঙ্গীণ এবং সমুচিত বিকাশ হতে সুরু করে।

সর্বাঙ্গীণ এবং সমুচিত বিকাশ না হলে আমরা নিজেদের স্বাস্থ্য হারিয়ে ফেলি। শরীরের কোন একটি অঙ্গ যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিকশিত হয় এবং বাকি

অঙ্গগুলো অবিকশিত থেকে যায়, তাহলে গোটা শরীরের সঙ্গে বিকশিত অঙ্গটিকেও রুগ্নই বলা হয়ে থাকে। তদ্রুপ ধর্ম-শরীরেরও কোন এক অঙ্গ বেশী বিকশিত হয়ে গেলে অন্য অঙ্গগুলোর বিকাশের পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ফলে ধর্মশরীর তো রুগ্ন হয়ই, ঐ বিকশিত অঙ্গবিশেষকেও রুগ্নই বলা হয়ে থাকে। অতএব গোটা ধর্ম-শরীরকে সুস্থ এবং সবল রাখার জন্য ধর্মের সমস্ত অঙ্গগুলোই বিকশিত হওয়া প্রয়োজন। এই জন্য সমস্ত অঙ্গের বিবেকপূর্বক সমূচতি মূল্যাংকন হওয়া আবশ্যক। মালা তিলকের ন্যায় বাহ্যাড়ম্বর, নদী-স্নান, তীর্থ-পর্যটনের ন্যায় কর্মকাণ্ড, অথবা আত্মবাদ, অনাত্মবাদের ন্যায় বুদ্ধি-রঞ্জনীয় দার্শনিক মান্যতা ইত্যাদির কথা ছেড়েই দিন, যদি আমরা কোন ভাল ব্রত পালন করার সময়, অথবা কোন শীল পালন করার সময় তার অতিরঞ্জন করতে সুরু করি এবং শুদ্ধ ধর্মের অন্য অঙ্গগুলোর অবহেলা করে কেবল ঐ ব্রত এবং শীল নিয়েই পড়ে থাকি, তাহলে **ঐ শীলব্রত** আমাদের জন্য ভয়ংকর ব্যাধি হয়ে দাঁড়াবে। এর থেকে বাঁচার জন্য এবং শুদ্ধ ধর্মের সর্বাঙ্গীণ এবং সমুচিত বিকাশের জন্য প্রত্যেক কথার যথার্থ যথোচিত মুল্যাংকন হওয়া আবশ্যক। ধর্মময় মঙ্গল জীবনের এটাই কল্যাণমার্গ।

৭· যথার্থ কুশল

যথার্থ কুশল কিসে আছে?

যথার্থ কুশল নিজের মনকে স্বচ্ছ ও পরিষ্কার রাখার মধ্যেই নিহিত।

যখন আমরা দ্বেষ-দৌর্মনস্যে ডুবে থাকি এবং কর্কশ, কঠোর বাক্য বলতে থাকি, তখন আমাদের মনের স্বচ্ছতা আমরা হারিয়ে বসি। আর যখন স্বচ্ছতা হারিয়ে ফেলি, তখন সুখ-শান্তিও হারিয়ে বসি।

যখন আমরা স্নেহ এবং সৌমনস্যে ভরপুর থাকি এবং মধুর মিষ্টস্বরে কথা বলি, তখন মনের মালিন্য থেকে মুক্ত থাকি।এবং যখন মনের মালিন্য থেকে মুক্ত থাকি, তখনই বাস্তবিক সুখ-শান্তি লাভ করি।

দুষ্ট মন অন্যদেরও দুঃখী করে। কোন কোন অবস্থাতে অন্যদের দুঃখী করতে না পারলেও সকল অবস্থাতে নিজেকে তো দুঃখী বানায়! যখনই মন বিদ্বেষ এবং দুর্ভাবনার দ্বারা দূষিত হয়ে ওঠে, তখনই অনিবার্যভাবে নিজেও অস্থির এবং চঞ্চল হয়ে পড়ি।

সুস্থ মন অন্যদেরও সুখী করে। কোন কোন অবস্থাতে অন্যদের সুখী করতে না পারলেও, সকল অবস্থাতে নিজেকে তো সুখী বানায়! যখনই মন স্নেহ এবং সদ্‌ভাবনার দ্বারা সুমন হয়ে ওঠে, তখনই অনিবার্যভাবে নিজেও শান্তি এবং স্বস্তি লাভ করি।

সৌম্যনস্যতার দ্বারা পূর্ণ মন সুখী থাকে। দৌর্মনস্যতার দ্বারা পূর্ণ মন দুঃখী থাকে। এটাই প্রকৃতির অটুট নিয়ম। এটাই সত্য। এটাই ধর্মনিয়ামতা।

সাধকগণ, প্রকৃতির অটুট নিয়মের প্রতি, এই সত্য এবং এই ধর্মনিয়ামতার প্রতি সর্বদা সজাগ থাকুন এবং নিজের মনকে সৌমনস্যতার দ্বারা পূর্ণ এবং দৌর্মনস্যতা থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করতে থাকুন।

এতেই নিজের বাস্তবিক কুশল। এতেই নিজের বাস্তবিক মঙ্গল।

৮· সমতা ধর্ম

সমতাই ধর্ম। বিষমতা অধর্ম। সমতা অনাসক্তি। বিষমতা আসক্তি। যেখানে আসক্তি সেখানেই দুঃখ। যেখানে অনাসক্তি সেখানেই আসল সুখ, আসল শান্তি।

বিদর্শন সাধনার দ্বারা আমরা দেখি যে শরীরে প্রবাহিত এই চিত্তধারাতে বিবিধ কারণে সময়ে সময়ে সুখদ এবং দুঃখদ উভয় প্রকার সংবেদনা প্রকট হতে থাকে। সুখদ সংবেদনা আমাদের প্রিয় লাগে এবং তার প্রতি আমাদের অনুরাগ উৎপন্ন হয়। পরিণামে তাকে ধরে রাখার জন্য আমরা তৎপর থাকি। পাছে সেটা হারিয়ে যায়, সেজন্য আশংকিত, আতংকিত হয়ে উঠি। অসুরক্ষারই মিথ্যা সেবা করতে থাকি। কিন্তু প্রকৃতির পরিবর্তনশীল নিয়মের কারণে এই সুখদ বেদনা নষ্ট হবেই। আর যখন দুঃখদ সংবেদনা প্রকট হয়, তখন তার প্রতি জাগে বিদ্বেষ। তখন তাকেই দূর করার জন্য আমরা অস্থির হয়ে উঠি। এটা কি কখনও দূর হবে না?—এই ভয় এবং আশংকায় আমরা আতংকিত হয়ে উঠি। আবার আমরা অসুরক্ষারই চাঞ্চল্যে বাঁধা পড়ে যাই। অতএব সুখ-দুঃখ উভয় অবস্থাতেই আমরা অশান্ত এবং অস্থির থাকি। অনুরাগ এবং বিদ্বেষ থেকে আসক্তি জন্মে। অনুরক্ষার ভাবনা জাগে। মন তার ভারসাম্য হারিয়ে বসে। এটাই হচ্ছে বিষমতা। সুখদ-দুঃখদ যে কোন অবস্থা বর্তমান থাকাকালীন রাগ-দ্বেষ থেকে মুক্ত থাকার নামই অনাসক্ত হয়ে থাকা। তাহলেই সুরক্ষিততার পোষণ করা হবে। মনের ভারসাম্য নষ্ট হবে না এবং শান্ত থাকা যাবে।

সুখদ এবং দুঃখদ স্থিতির প্রতি পূর্ণ সংবেদনশীল এবং সজাগ থেকেও অবিচলিত থাকার নামই সমতা। সমতা মানে ক্লীব্য জড়তা নয়। সমতা মানে শ্মশানের শান্তি নয়। যেখানে চিত্তের উত্তেজনা-কারী আলম্বন-উদ্দীপনাই নেই, সেই সমতাই যে যথার্থ সমতা কিভাবে বলা যাবে? যেখানে উত্তেজনা সৃষ্টিকারী আলম্বন-উদ্দীপনা থাকলেও উত্তেজিত হবার মতো চিত্ত সুষুপ্ত থাকে, সেই সমতাই যে যথার্থ সমতা কিভাবে বলা যাবে? সমতা নেতিবাচক নয়; মূঢ়তা, মূর্ছা, কুণ্ঠা নয়। কেউ আমাকে সব্জী কাটার মতো করে কেটে যাবে, আর আমি বুঝতেও পারবো না—এরূপ অবস্থার নাম সমতা নয়। সমতা কোন এনেসথেসিয়ার ঘ্রাণ বা মর্ফি ইন্‌জেকশন নয়। পূর্ণ চেতন অবস্থাতেই সুখদ-দুঃখদ যে কোন স্থিতিতে চিত্তের সাম্য বজায় রাখার নামই সমতা। অন্যথা গভীর নিদ্রায় সুষুপ্ত ব্যক্তি অথবা মূর্ছিত বা মূঢ় ব্যক্তিও সমতার দম্ভ করতে পারে।

সুখদ স্থিতিতে প্রফুল্ল হয়ে ওঠা এবং দুঃখদ স্থিতিতে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ার নামই বৈষম্য। উভয়ই বর্তমান থাকাকালীন চিত্তের ভারসাম্য বজায় রাখাই সমতা। কিন্তু সমতা আমাদের অশক্ত এবং নিষ্কর্মা করে না। সত্যিকার সমতা এলেই প্রবৃত্তি জাগে। এই প্রবৃত্তি পরম পুরুষার্থের রূপ ধারণ করে। পরম পুরুষার্থে আপন পরের ভেদাভেদ থাকে না। এইরূপ পুরুষার্থ-প্রদায়িনী সমতা যতই সরল হবে জীবনে ততই মঙ্গল হবে। আত্মমঙ্গলও হবে, জনসাধারণের

মঙ্গলও হবে। সমতা যত দুর্বল হবে ততই অনর্থকারিণী হবে—নিজেরও অনর্থ ঘটাবে, অন্যদেরও।

সমতা ধর্ম জীবন-জগত থেকে দূরে পালিয়ে যাওয়া নয়। পলায়ন নয়। জীবন-বিমুখতা নয়। সমতা ধর্ম হচ্ছে জীবন-অভিমুখ হয়ে বাঁচা। জীবন থেকে দূরে পালিয়ে কোথায় যাবেন? বিষয় থেকে দূরে পালিয়ে কোথায় যাবেন? সারা সংসার বিষয়ে পরিপূর্ণ। বিষয় আমাদের কি ক্ষতি করে? বিষয় আমাদের শত্রুও নয়, ভালও নয়, মন্দও নয়। ভাল-মন্দ হচ্ছে বিষয়ের প্রতি আমাদের নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ। অনাসক্ত অথবা আসক্ত দৃষ্টিকোণ। সম অথবা বিষম দৃষ্টিকোণ। যদি আমরা বিষয় থেকে দূরে পালিয়ে না গিয়ে বিষয় থেকে উৎপত্তিশীল বিকারসমহূকে সমতা অর্থাৎ অনাসক্তি দিয়ে দেখতে শিখি, তাহলে ঐ বিষয়গুলো থাকলেও আমরা বিকাসমূহকে নিস্তেজ করতে পারি। সমতার দ্বারা দেখাই বিশেষরূপে দেখা। প্রজ্ঞাপূর্বক দেখা। সম্যগ্ দৃষ্টিতে দেখা। ইহারই নাম বিদর্শন, ইহারই নাম বিপশ্যনা। সমতাময়ী বিদর্শনের দৃষ্টি প্রাপ্ত হলে 'আমি' 'আমার' এবং 'রাগ-দ্বেষ' এর প্রভাব দূর হয়ে যায়, যেটা যেমন তাকে তেমনভাবেই দেখতে পাই। এবং তখন আমরা অন্ধ প্রতিক্রিয়া করা ছেড়ে দিই। সমতার সুদৃঢ় ভূমিতে স্থির হয়ে আমরা যা কিছুই করি না কেন, সেই ক্রিয়াই শুদ্ধ ক্রিয়া হয়, প্রতিক্রিয়া নয়। এইজন্য ইহা কল্যাণকারী হয়, অমঙ্গলকারী হয় না।

ভেতরের চিত্তপ্রবাহে জাগ্রত সুখদ-দুঃখদ সংবেদনাসমূহের প্রতি পূর্ণ সমতার ভাব আসতে সুরু করলে বাহ্য জীবনেও সহজ সমতা প্রকট হতে সুরু করে। বাহ্য জীবন-জগতের সমস্ত বিষমতাও আন্তরিক সমতাকে ভঙ্গ করতে পারে না। জীবনে আগমনশীল পতন-উত্থান, জোয়ার-ভাটা, বসন্ত-শীত, ছায়া-রৌদ্র, বর্ষা-গ্রীষ্ম, হার-জিত, নিন্দা-প্রশংসা, মান-অপমান, লাভ-লোকসান প্রভৃতি দ্বন্দ্বের দ্বারা মন বিচলিত হয় না। সমস্ত স্থিতিতে সাম্যভাব উৎপন্ন হয়।

আন্তরিক সমতার পুষ্টির দ্বারাই যোগ-ক্ষেম পুষ্ট হয়। ইহারই বলে হাজার প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও নিজের সুরক্ষা বিষয়ে মিথ্যা ভয় দূরীভূত হয়। জীবনে বৈশারদ্য আসে, নির্ভরতা আসে। ভবিষ্যতে কি হবে—এইজন্য চিন্তিত, ব্যথিত, আকুল-ব্যাকুল হতে হয় না। আমার স্ত্রী-পুত্র, ধন-দৌলত, পদ-প্রতিষ্ঠা, মান-মর্যাদা, সত্তা-শক্তি, স্বাস্থ্য-আয়ু সুরক্ষিত থাকবে কি না—এইসব নিরর্থক চিন্তা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তনশীল প্রকৃতিকে অপরিবর্তনীয় বানিয়ে রাখার প্রমত্ত প্রয়াস, জীবন-জগতের সতত প্রবহমান ধারাকে রুদ্ধ করে রাখার উন্মত্ত আগ্রহ, জলের বুদ্বুদকে মুঠোর মধ্যে রেখে দিয়ে 'আমার আমার' বলে ধরে রাখার ন্যায় মিথ্যা নিরর্থক প্রযত্ন সহজেই দূরীভূত হয়। জীবন থেকে কুটিলতা বিষমতা উত্তেজনা স্বতঃই দূর হতে সুরু করে। পরিস্থিতিসমূহের পরিবর্তনশীল তরঙ্গসমূহকে সহজভাবেই অতিক্রম করার শক্তি আসে। নিতান্ত

কর্মশীল থাকলেও পরিণামসমূহের প্রতি উন্মুক্ত নিশ্চিন্ততা আসে এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহার কৌশল্যে প্রৌঢ়ত্ব অর্থাৎ পরিপক্কতা আসে। ইহাই সমতা ধর্মের মঙ্গল পরিণাম।

সমতা এলে মানসিক, বাক্ এবং কায়কর্মে শুদ্ধতা আসে। তাতে সামঞ্জস্য আসে। পরিণামে জীবনে সুখ আসে। বাত-পিত্ত-কফে বিষমতা এলে শরীর দুর্বল হয়। তদ্রুপ মানসিক, বাক্ এবং কায়কর্মে বিষমতা এলে জীবনও রুগ্ন হয়। একটা আছে, অথচ অন্যরকম বললে বা অন্যরকম করলে তো জীবন অসুস্থ হবেই। তাল, স্বর এবং লয়ের সমতার দ্বারা যেমন তন্ময়তা আসে, তদ্রুপ মন-বাক্-কায় কর্মের সমতার দ্বারাও তন্ময়তা আসে। পরম সুখ প্রাপ্ত হয়। সমতার যে সুখ তা সংসারের অন্যান্য সুখ অপেক্ষা উত্তম এবং শ্রেষ্ঠ।

সমতাই হচ্ছে সুস্থতা। মনের সমতা নষ্ট হয়ে গেলে নানা প্রকার রোগ উৎপন্ন হয়—মানসিক এবং শারীরিক। সমতাপূর্ণ জীবন যাপনকারী কুশলী ব্যক্তিই সুস্থ জীবন যাপন করেন। সমতাময় জীবন যাপনকারীর অহংভাব, আত্মভাব নষ্ট হয়। তিনি অহমিকাশূন্য অনাত্মভাবের মঙ্গল জীবন যাপন করেন। 'আমি' আর 'তুমি'র বিষমতাপূর্ণ একান্তীয় একপক্ষীয় দৃষ্টিকোণ দূরীভূত হয়। সমতা-সমন্বয়ের অনেকান্তীয় অনেকপক্ষীয় দৃষ্টিকোণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। বিষমতা মানুষকে আসক্তির দিকে টেনে নিয়ে যায়। আসক্তি নিয়ে যায় আতিশয্যের দিকে এবং আতিশয্যের দিকে ঝুঁকে পড়ার দরুণই ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের দৃষ্টিকোণ উৎপন্ন হতে সুরু করে। "কেবল আমারই মুক্তি হোক, বাকী সমাজ জাহান্নমে যাক। এই স্ত্রী-পুত্র, ভাই-বন্ধু সবই তো বন্ধন। এদের সঙ্গে আমার কীইবা লেনদেন? আমি কিভাবে নিজে মুক্তি পাব? এদের ভালমন্দের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই।"—এইরূপ চিন্তাশীল ব্যক্তি আতিশয্যের এক অন্তে জড়িয়ে থাকে। কেউ কেউ আবার কেবল 'আমি' এবং 'আমার পরিবার' এই দুয়ের সীমিত পরিধিতে আকণ্ঠ ডুবে থাকে। তারা আতিশয্যের দ্বিতীয় অন্তে জড়িয়ে থাকে । সমতা ধর্ম হচ্ছে এই দু'য়ের মধ্যম পন্থার ধর্ম। সমতা ধর্ম আত্মমঙ্গল এবং পরমঙ্গলের সমন্বয়-সামঞ্জস্যের ধর্ম। ব্যক্তি জঙ্গলের বৃক্ষ-লতাগুল্মের ন্যায় স্থাবর নয়। ব্যক্তি হচ্ছে জঙ্গম; চলা-ফেরা করে; অন্য অনেক লোকের সঙ্গে তার সম্পর্ক এবং সম্বন্ধ। আত্মশোধনের জন্য কিছুকাল একান্ত বাস করা এবং অন্তর্মুখী হওয়া আবশ্যক এবং কল্যাণকারী, কিন্তু এই প্রকারে শুদ্ধকৃত মনকেই বহির্জগতে সম্যগ্‌ভাবে প্রয়োগ করতে পারলেই ধর্ম পুষ্ট হয়।

'আমি'র সংকুচিত বিন্দুর দ্বারা আবদ্ধ থাকার দরুণই আমাদের দৃষ্টি ধূমায়িত হয়ে যায়। কর্মসিদ্ধান্তের বৈজ্ঞানিকতা স্পষ্ট বুঝতে পারিনা। আসক্তির জন্য আতিশয্যের দিকে আমরা ঝুঁকে পড়ি, আর এটা মানতে সুরু করি যে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের পূর্ব পূর্ব কর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয়। কাজেই অন্যদের কর্মের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। এটা সত্যি যে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের কর্মের

দ্বারা প্রভাবিত, কিন্তু গোটা সমাজের কর্মের দ্বারাও সে কম প্রভাবিত হয় না। ব্যক্তি নিজ কর্মের ফলিত পুতুল তো বটেই, কিন্তু সমগ্র মানবসমাজের আজ পর্য্যন্ত যে প্রগতি বা প্রতিগতি হয়েছে তাতেও ব্যক্তির কর্মের অবদান রয়েছে। কারণ আমাদের কর্ম আমাদের তো প্রভাবিত করেই, এবং কমবেশী অন্যদেরও প্রভাবিত করতে থাকে। আমরা নিজেদের কর্মের ফল নিজেদের সংসার স্রোতকে দিয়েই তো থাকি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যতের বংশধরদেরও কিছু কিছু দিয়ে থাকি। ব্যক্তি কখনও সমষ্টি থেকে আলাদা থাকতে পারেনা, সমষ্টিও কখনও ক্তি থেকে আলাদা থাকতে পারে না। ব্যক্তি কখনও সমাজ থেকে আলাদা তে পারে না, সমাজও কখনও ব্যক্তি থেকে আলাদা থাকতে পারে না। ৩৬য়েই একে অন্যের উপর আশ্রিত। একে অন্যের পরিপূরক। অতএব ব্যক্তি এবং সমুদায়ের সম্বন্ধে সমতা এবং সামঞ্জস্য স্থাপন করাই শুদ্ধ ধর্মের মঙ্গল পরিণাম। সমতার শুদ্ধ ধর্ম যতই বিকশিত হবে ব্যক্তি ততই 'আমিত্বের' সংকুচিত বিন্দু থেকে এগিয়ে যেতে পারবে। এই 'আমিত্বের' বিন্দুই নিজের 'আমার' গণ্ডি সৃষ্টি করতে থাকে। ক্রমশঃ এই 'আমার আমার' গণ্ডীর সংকীর্ণতাও দূর হয়ে যায়। 'আমার'-এর গণ্ডী বিকশিত হতে হতে সাম্যের পূর্ণতা প্রাপ্ত হওয়ার পরে অসীম হয়ে যায়।

যতদিন পর্য্যন্ত 'আমি'র সংকীর্ণতায় আবদ্ধ থাকে, ততদিন এই 'আমি'র জন্য কারও ক্ষতি করতেও মানুষ দ্বিধা করেনা। পরিধি একটু বিস্তৃত হলে যেগুলোকে 'আমার' 'আমার' বলে সেগুলোর ক্ষতি সাধন থেকে সে নিবৃত্ত হয়। 'আমি'র গণ্ডী থেকে বেরিয়ে আসতে পারলে 'আমার'-এর সংকুচিত গণ্ডীও সীমিত হয়ে যায়। 'আমার স্ত্রী', 'আমার পুত্র' এই গণ্ডী পর্য্যন্ত। আরও আগে এগিয়ে যেতে পারলে 'আমার কুল', 'আমার গোত্র', 'আমার বর্ণ', 'আমার জাতি', 'আমার সম্প্রদায়', 'আমার রাষ্ট্র' এর পরিধিতে আটকে থাকে। সমতাধর্মে পরিপুষ্ট হতে পারলে ঐ পরিধির গণ্ডীও ছিন্ন হয়। কেবল মানবমাত্র নহে, প্রাণিমাত্রেরই হিতসুখে নিজের হিতসুখ দেখতে থাকে। কোনও প্রাণীর হিতসুখ নষ্ট করে নিজের হিতসুখের কুচেষ্টা করা তো দূরের কথা, সেরূপ চিন্তাও মনে স্থান দিতে পারে না।

যেখানেই গণ্ডী সেখানেই বিষমতা। গণ্ডী যতই সংকুচিত হবে বিষমতা ততই তীব্র হবে। সাম্যেরও ততখানি অভাব হবে। সাম্যের অভাবের জন্যই 'আমি' এবং 'আমার' এই দুয়ের হিতসুখের জন্য এবং উক্ত হিতসুখের রক্ষার জন্য যে 'আমি' নহে এবং যে 'আমার' নহে তার হানি করতেও মানুষ দ্বিধা করে না। যতক্ষণ মনোভাব এইরূপ থাকবে ততক্ষণ জীবন পাপেই পরিপূর্ণ থাকে। যেটা 'আমি-আমার', তারজন্য 'এক কণাও' জোটাতে পারলে যেটা 'আমি-আমার' নয় তার 'এক মনও' মাটিতে মিলিয়ে দিতে মানুষ দ্বিধা করে না। 'আমি-আমার'-এর জন্য কোন দুর্বলের মুখের গ্রাসও কেড়ে নিতে ইতস্তত করে না। এই

'আমি-আমার'-এর অন্ধতায় অন্ধ হয়ে জঘন্য থেকে জঘন্যতম পাপকর্ম করাও অনুচিত বলে মানুষের মনে হয় না।

বিষমতা 'আমি-আমার' ভাবের জননী। আমি-আমার ভাব বিষমতার পোষক। আমি আমার ভাবের জন্যই আমরা তীব্র লোভের বশীভূত হয়ে সংগ্রহ-পরিগ্রহে লিপ্ত হই, কেবল নিজেরই সঞ্চয়ের জন্য ব্যস্ত হই এবং অন্য অনেককে অভাবগ্রস্ত করে সামাজিক হত্যা করি। তীব্র দম্ভের বশীভূত হয়ে উচ্চ কুল, উচ্চ বর্ণ এবং উচ্চ জাতির অহংকার মাথায় চাপিয়ে থাকি এবং সমাজে উঁচু-নীচুর ভেদভাব উৎপন্ন করে সামাজিক সমতাকে হত্যা করি। ব্যক্তিসত্তার মদে বেঁহুশ হয়ে দুর্বল এবং সাধারণ লোকদের দমন এবং শোষণ করতে থাকি এবং এইভাবে সামাজিক সমতাকে হত্যা করি। এইভাবে আর্থিক, সামাজিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজের 'অহং'কে পোষণ করতে গিয়ে বৈষম্য সৃষ্টি করি। অন্যদের সমান অধিকারকে পদদলিত করে নির্মম পৈশাচিক ব্যবহার করি এবং নিজের তথা অন্য সকলের দুঃখের কারণ হয়ে থাকি। এর সবই সমতার অভাবের কারণেই হয়ে থাকে। নিজ পরের ভেদ মিটিয়ে সাম্যভাব মনে আনতে পারলেই এইরূপ নৃশংসতা করা থেকে আমরা মুক্ত হতে পারবো। কোন ভেজাল ওষুধের কারবারী কখনও নিজের রোগগ্রস্ত পুত্রকে সে ওষুধ খেতে দেয় না। আপন-পর ভেদাভেদ দূর করতে পারলে কখনও কাউকে আমরা ভেজাল ওষুধ খেতে দেব না। যদি আমি ঘুষখোর শাসক বা শাসনাধিকারী হই তাহলে কখনও নিজের ছেলের কাছ থেকে ঘুষ নেব না। আপন-পর ভেদ দূর হলে কখনও অন্য কারও কাজ থেকে ঘুষ নেব না। যদি আমি উচ্চবর্ণের মিথ্যা দম্ভের শিকার হয়ে থাকি, তাহলেও কখনও নিজের ছেলেকে অচ্ছুত বলে দূরে সরিয়ে দেবো না। আপন-পর ভেদ দূর হলে কখনও কাউকে অচ্ছুত বলে প্রত্যাখ্যান করবো না। আপন-পরের ভেদ দূর হওয়াই হচ্ছে বৈষম্য দূর হওয়া এবং সর্বমঙ্গলকারী সাম্যভাবের প্রতিষ্ঠা হওয়া।

যেখানে শুদ্ধ সাম্যভাব প্রতিষ্ঠিত হয়, সেখানে আপন-পরের সীমাবন্ধন ছিন্ন হয়। পরিণামে শোষণ বন্ধ হয়, সহকারিতা আসে। ক্রূরতা বন্ধ হয়, মৃদুতা আসে। অন্যায় বন্ধ হয়, ন্যায় আসে। সংকীর্ণতা বন্ধ হয়, বিশালতা আসে। অহংভাব-হীনভাব বন্ধ হয়, ভ্রাতৃভাব আসে। অধর্ম বন্ধ হয়, ধর্ম আসে।

একটা দিক হচ্ছেঃ নিজের মিথ্যা স্বার্থসমূহের সুরক্ষার জন্য ভয়ভীত এবং আতঙ্কিত হয়ে কোন দুর্বল ব্যক্তিকে কনুই দিয়ে ধাক্কা মেরে নীচে ফেলে পায়ের তলায় পিষ্ট করার ক্রূরতা। আর একটা দিক হচ্ছেঃ যোগক্ষেমের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে নির্ভয়ে থেকে সকলের হিতসুখের মধ্যে হিতসুখ দেখার বিশালহৃদয়তা। এই দুই দিকের মাঝখানের যাবতীয় স্থিতি অর্থাৎ সব কিছু সমতা ধর্ম বিকাশেরই সোপান।

সমতা পুষ্ট হলে সামঞ্জস্য আসে, সমন্বয় আসে, স্নেহ-সৌহার্দ আসে, সহিষ্ণুতা

আসে। সহযোগ, সদ্‌ভাব এবং সহকারিতা সহজভাবের দ্বারাই আসে। এগুলোর জন্য প্রযত্ন করতে হয় না। এ সব না আসতে থাকলে বুঝতে হবে আমরা অনেক পিছিয়ে আছি। এখনও জীবনে যথার্থ বিপশ্যনা (বিদর্শন), যথার্থ সমতা আসে নি। সমতার সাধনার নামে কোন ছলনা কোন মায়া বা কোন ধোঁকা এসে থাকবে। দার্শনিক বুদ্ধিবিলাসের কোন এক চমৎকারী পটুত্ব এসে থাকবে। অবশ্যই অন্তর্মন এখনও বিষমতায় পূর্ণ আছে। নিজে নিজেকে এভাবে কষ্টিপাথরে ফেলে বিচার করতে হবে।

বাস্তবিক সমতা পুষ্ট হলে নিজের ক্ষতি করেও আমরা অন্যের হিতসাধন করবো এবং সেটা সহজভাবেই করতে পারবো। দীপের বাতি স্বয়ং জ্বলে শুধু নয়, অন্যদেরও আলোকিত করে। ধূপবাতি স্বয়ং জ্বলে শুধু নয়, অন্যদেরও সুবাসিত করে। চন্দনকাঠ ঘর্ষিত হলেও অন্যদের সুরভি প্রদান করে। ফলবান বৃক্ষ ঢিলের আঘাত সহ্য করেও সকলকে ফল দান করে। এবং এই সব কিছুই সহজভাবেই হয়ে থাকে। সমতা সহজ হয়ে গেলেও তদ্রুপ সকলের মঙ্গলের স্রোত উন্মুক্ত হবে।

এইরূপ সর্বমঙ্গলময় সমতা ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য অভ্যাস করুন।

৯· সরল চিত্ত

সরলতাই চিত্তের বিশুদ্ধি। কুটিলতা হচ্ছে মলিনতা। মলিনতা অনর্থকারিণী, বিশুদ্ধতা সর্বার্থসাধিনী। কুটিলতা সর্ব-হিত-নাশিনী সরলতা সর্বহিতকারিণী। শুধু নিজের নয়, সকলের হিতসুখ সাধনের জন্য সরলতার আশ্রয় করুন, কুটিলতা পরিহার করুন।

নৈসর্গিক স্বচ্ছ মন স্বভাবতই সরল হয়। সরলতা চলে গেলে বুঝতে হবে স্বচ্ছতাও চলে গেছে। সরলতা হারাবার তিনটি কারণ আছে যার থেকে আমাদের সাবধানতার সহিত বাঁচতে হবে। কোন তিনটি? তৃষ্ণা, অহংমন্যতা এবং দার্শনিক মতবাদসমূহ বা মিথ্যাদৃষ্টি। এই তিনটির মধ্যে যে কোন একটার প্রতি যত আসক্তি উৎপন্ন হবে, আমরা ততখানি সরলতা হারিয়ে বসি, ততখানি স্বচ্ছতা বিনষ্ট করি। আমরা ততটা মলিন হয়ে যাই, সুখশান্তিবিহীন হয়ে যাই এবং ততটা দুঃখী হয়ে পড়ি।

যখন কোন বস্তু, ব্যক্তি বা স্থিতির প্রতি তৃষ্ণা জাগে এবং আসক্তি বাড়ে, তখন তাকে পাবার জন্য এবং পেলে নিজের অধিকারে রাখার জন্য আমরা যে কোন নিকৃষ্ট পন্থা অবলম্বন করতেও দ্বিধা করিনা। চুরি, ডাকাতি, মিথ্যা-প্রতারণা, ছল-চাতুরী, প্রপঞ্চ-প্রবঞ্চনা, ধোঁকা-ধড়িবাজী ইত্যাদি সব কিছুর আশ্রয় নিয়ে থাকি। নিজের পাগলামিতে মনের সমস্ত সরলতা হারিয়ে ফেলি। নিজের ঈপ্সিতকে হাসিল করার চিন্তায় সাধনার পবিত্রতা হারিয়ে ফেলি। প্রিয়ের প্রতি অনুরোধই অপ্রিয়ের প্রতি বিরোধ উৎপন্ন করে। এতে আমরা এতই প্রমত্ত হয়ে উঠি যে, তৃষ্ণা-পূরণে যত বাধাই থাকুকু না কেন তাকে দূর করার জন্য, নষ্ট করার জন্য সীমাহীন ক্রোধ, রোষ, দ্বেষ, মোহ, দ্রোহ, দৌর্মনস্য এবং দুর্ভাবনা সৃষ্টি করি এবং পরিণামস্বরূপ নিজের সুখশান্তি নষ্ট করি। মনের সরলতা নষ্ট করে ফেলি।

এইভাবে যখন 'আমি-আমার'-এর প্রতি আসক্তি বাড়ে, তখন ঐ মিথ্যা কল্পিত 'আমি-আমার'-এর মিথ্যা সুরক্ষা এবং মিথ্যা হিতসুখের জন্য তাদের অনেক বৃহৎ থেকে বৃহত্তর ক্ষতিসাধন করি যাদের 'আমি-আমার' বলে মানতে পারিনা। এরূপ করতে গিয়ে বস্তুতপক্ষে নিজেরই অধিক ক্ষতিসাধন করি। নিজের মনের সরলতাকে হত্যা করি, নিজের আন্তরিক স্বচ্ছতা হারিয়ে ফেলি, নিজের সুখশান্তি বিনষ্ট করি। অন্যদের ঠকাতে গিয়ে নিজেই ঠকে যাই।

তদ্রুপ যখন কোন দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী অথবা সাম্প্রদায়িক মান্যতার প্রতি আমাদের আসক্তি হয়, তখন আমরা সংকীর্ণতার শিকার হয়ে পড়ি এবং মনের সহজ সরলতা হারিয়ে ফেলি। মন যখন জলের ন্যায় সহজ-সরল-তরল হয়, তখন নিজেই নিজেকে সত্যের পাত্রের অনুকূলে প্রবাহিত করে এবং নিজের সরলতাও নষ্ট করেনা। পথে বাধা এলে কলকল স্বরে তার পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়। কোন বাধা তাকে দ্বিধাবিভক্ত করলেও কিছুটা এগিয়ে গিয়ে সে আবার

জুড়ে যায়। যেমন ছিল ঠিক তেমন রূপ ধারণ করে। যদি কোন অবরোধ প্রাচীরের মতো সামনে এসে গতিরোধ করে, তাহলে ধৈর্য্যপূর্বক ধীরে ধীরে উঁচুতে উঠে প্রাচীর অতিক্রম করে সহজভাবেই আগে এগিয়ে যায়। কিন্তু যখন মন পাথরের মতো কঠোর হয়, তখন পরস্পর ঠোক্কর খেয়ে খেয়ে চূর্ণবিচূর্ণ হয়। যখন আমাদের দৃষ্টি দার্শনিক বিশ্বাস, অন্ধমান্যতা, কর্মকাণ্ড এবং বাহ্য আড়ম্বরের প্রতি আসক্ত হয়ে রূঢ় হয়ে যায়, তখন পাথরের মতো হয়ে যায়। এই প্রস্তরীভূত দৃষ্টি নির্জীব হয়ে যায়, আমাদের অন্ধ করে দেয় এবং আমাদের কল্যাণের রাস্তা বন্ধ করে দেয়। সাম্প্রদায়িকতার দাসত্বে জড়িয়ে থাকার ফলে আমরা 'সত্য'কে নিজের চশমায় দেখতে চাই। তাকে ভেঙেচুড়ে নিজের মনের মতো বানাতে চাই এবং তার উপর রং-টং চাপিয়ে তার সহজ স্বাভাবিকতা, সহজ সৌন্দর্য্য নষ্ট করে ফেলি। এই অপপ্রয়াসে নিজের মনের সরলতা নষ্ট করে ফেলি। মনকে কুটিলতায় পূর্ণ করি।

কুটিলতা হচ্ছে কঠোরতা, সরলতা হচ্ছে মৃদুতা। কুটিলতা হচ্ছে অভিমানতা, সরলতা হচ্ছে নিরভিমানতা। কুটিলতা হচ্ছে গ্রন্থিবন্ধন, সরলতা হচ্ছে গ্রন্থি-বিমোচন।

গ্রন্থিবন্ধন বড়ই দুঃখদায়ী। প্রকৃত সুখ তো গ্রন্থিবিমোচনের মধ্যেই, বিমুক্তির মধ্যেই। যখনই সরলতা হারিয়ে কুটিলতার শিকার হয়ে পড়ি, তখনই নিজের মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলি। ভেতরে ভেতরে উত্তেজনা সুরু হয়ে যায়। অজ্ঞাতসারেই গ্রন্থিবন্ধন সুরু হয়ে যায়। অন্তর্মন জটিল হয়ে যায়। তার সাথে সাথে শরীরের শিরা-উপশিরা মুঞ্জ ঘাসের দড়ির মতো শুকিয়ে যায়। এতে আমরা চঞ্চল, অশান্ত এবং ব্যাকুল হয়ে পড়ি। আমাদের এই আন্তরিক ব্যাকুলতা উত্তেজনার রূপ নিয়ে বাইরে প্রকট হয় এবং এইভাবে আমরা নিজেদের অশান্তি আমাদের উপর বর্ষণ করতে সুরু করি।

অন্যদিকে মন যখন সহজ-সরল থাকে, তখন মৃদু-মধুর, সৌম্য-স্বচ্ছ, শীতল-শান্ত থাকে। শরীরও হাল্কা এবং পুলক-রোমাঞ্চে পূর্ণ থাকে। পরিণামে আমরা প্রীতি-প্রমোদ এবং সুখ-সৌহার্দ্রে পূর্ণ হয়ে উঠি। আমাদের এই আন্তরিক প্রীতি ও সুখ মৈত্রী এবং করুণার রূপে বাইরে প্রকট হয় এবং এইভাবে আমরা নিজের সুখশান্তি অন্যদেরও বন্টন করতে থাকি। আশেপাশের গোটা বায়ুমণ্ডলকে প্রসন্নতায় ভরপুর করি।

অতএব, আত্মহিত, পরহিত এবং সর্বহিতের জন্য কুটিলতা ত্যাগ করুন, সরলতা আয়ত্ত করুন।

কুটিলতায় মহা অমঙ্গল নিহিত আছে, সরলতায় মহামঙ্গল।

১০. ধর্মের সর্বহিতকারী স্বরূপ

মনুষ্য সামাজিক প্রাণী। সমাজ থেকে আলাদা থাকা তার পক্ষে উচিতও নয়, সম্ভবও নয়। সমাজে থেকেই সমাজের জন্য অধিক থেকে অধিকতর সুস্থ এবং সহায়ক হতে হবে—এতেই মনুষ্যজীবনের উপাদেয়তা এবং সার্থকতা। সুস্থ ব্যক্তিদের দ্বারাই সুস্থ সমাজের গঠন সম্ভব। অসুস্থ ব্যক্তি হচ্ছেন তিনি যাঁর মন বিকারসমূহের দ্বারা বিকৃত থাকে। এইরূপ ব্যক্তি নিজে তো দুঃখী থাকেই উপরন্তু নিজের সম্পর্কিত অন্যদেরও উত্তপ্ত করে। অতএব সুখী ও সুস্থ সমাজ তৈরী করার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকেই সুখ ও স্বাস্থ্যের দ্বারা ভরপুর করা নিতান্ত আবশ্যক। প্রত্যেক ব্যক্তির চিত্ত যদি স্বচ্ছ হয়, শান্ত হয় তাহলে সমগ্র সমাজের শান্তি বজায় থাকে। ধর্ম এই ব্যক্তিগত শান্তির জন্য এক অনুপম সাধনা এবং সেজন্য বিশ্ব-শান্তিরও একমাত্র সাধন।

ধর্মের অর্থ সম্প্রদায় নহে। সম্প্রদায় মানুষ-মানুষের মধ্যে এবং ব্যক্তি-ব্যক্তির মাঝখানে বিভেদের প্রাচীর সৃষ্টি করে। কিন্তু শুদ্ধ ধর্ম এই প্রাচীর ভেঙ্গে দেয়, বিভেদ দূর করে।

শুদ্ধ ধর্ম মানুষের ভেতরে সুপ্ত অহংভাব এবং হীনভাবকে সমূলে উৎপাটিত করে। মানুষের মনের আশংকা, উত্তেজনা, উদ্বিগ্নতাকে দূর করে এবং তাকে (মনকে) স্বচ্ছতা ও নির্মলতার সেই ধরাতলে প্রতিষ্ঠিত করে যেখানে অহংকারজনিত দম্ভ টিকতে পারে না এবং হীনভাবের গ্রন্থি সমূহের দ্বারা গ্রথিত দৈন্য বাড়তে পারে না। জীবনে সমতা আসে এবং প্রত্যেক বস্তু, ব্যক্তি এবং স্থিতিকে তার যথার্থ স্বরূপে দেখার নির্মল প্রজ্ঞা জাগায়। অতিরঞ্জনা এবং অতিশয়োক্তিতে নিমজ্জিত ভক্তি-ভাবাবেশ দূর হয়। জ্ঞান, বিবেক, বোধির অর্ন্তচক্ষু বিরজ এবং বিমল হয়ে যায়। অর্ন্তদৃষ্টি পারদর্শিতা লাভ করে। তার সামনে যে সমস্ত কুয়াসা অন্ধকার সমস্ত দূর হয়ে যায়। এই যে আমরা শোনা কথা বা পড়া কথাসমূহের দ্বারা আমাদের মনকে বিকৃত করে ফেলেছি, এই পূর্বাগ্রহরূপী বিকৃতিগুলো সত্যদর্শনে বাধা সৃষ্টি করে। পূর্বনিশ্চিত ধারণা এবং মান্যতাগুলোকে আমাদের চোখের উপর রঙীন চশমার ন্যায় লেগে থাকে এবং বাস্তব সত্যকে নিজের রঙে দেখার জন্যই আমাদের বাধ্য করে। ধর্মের নামে আমরা এই শৃঙ্খলকেই সুন্দর অলংকারের মতো পরিধান করে আছি। বাস্তবিক মুক্তির জন্য এই শৃঙ্খলকে ছিন্ন করা নিতান্ত আবশ্যক।

চিত্তকে রাগ, দ্বেষ, মোহ, ঈর্ষ্যা, মাৎসর্য, দুর্ভাবনা, দৌর্মনস্য, ভয়, আশংকা, মিথ্যা কাল্পনিক দৃষ্টি, মান্যতা এবং সংস্কারের বন্ধন থেকে মুক্ত করার জন্য আবশ্যক হচ্ছে—সমস্ত সংস্কারকে এক দিকে সরিয়ে দিয়ে, ভাবুকতাকে দূরে সরিয়ে, আমরা যথার্থ অর্থে বাঁচতে শেখা। যথার্থ অর্থে বাঁচা হচ্ছে বর্তমানে বাঁচা, এই মুহূর্তে বাঁচা। কারণ অতীত ক্ষণ বা মুহূর্ত যথার্থ নয়, সেটা তো সমাপ্ত হয়ে গেছে। এখন তো কেবল তাকে মনে পড়তে পারে, কিন্তু সেই

মুহূর্তটা তো আর নেই! তদ্রুপ যে মুহূর্ত ভবিষ্যতে আসবে, এখনও আসেনি, তারও কেবল কল্পনা এবং কামনাই হতে পারে, যথার্থ দর্শন নয়। বর্তমানে বাঁচার অর্থ—এই মুহূর্তে যা কিছু অনুভূত হচ্ছে তারই প্রতি জাগ্রত থেকে বাঁচা। অতীতের সুখদ বা দুঃখদ স্মৃতি অথবা ভবিষ্যতের সুখদ বা দুঃখদ আশা-আকাঙ্খা আমাদের বর্তমান থেকে অনেক দূরে নিয়ে যায় এবং এইভাবে আমাদের আসল জীবন থেকে বিমুখ রাখে। বর্তমান থেকে বিমুখ এইরূপ তুচ্ছ অসার জীবনই আমাদের বিভিন্ন ক্লেশের কারণ হয়ে থাকে। অশান্তি, অসন্তোষ, অতৃপ্তি, আকুলতা, ব্যথা এবং পীড়ার জন্ম দেয়। যদি আমরা 'এই মুহূর্তকে' যথাভূত দর্শন করে জীবন ধারণ করতে পারি তাহলে ক্লেশসমূহ থেকেও **স্বাভাবিক** মুক্তি লাভ করতে পারি।

এই দেশের এক মহাপুরুষ ভগবান তথাগত গৌতম বুদ্ধের এই প্রকার সম্যক্ সম্বোধি প্রাপ্তি হয়েছিল। এই মুহূর্তে যথার্থভাবে বাঁচতে শিখে চিত্তকে সংস্কারসমূহ থেকে বিহীন করে, পরম পরিশুদ্ধ করে, সর্ববন্ধনমুক্ত হওয়ার উপায় তাঁর জানা হয়েছিল। তিনি আজীবন মানুষকে এই কল্যাণকারী উপায় অভ্যাস করিয়েছেন। এই মঙ্গলময়ী বিধিরই নাম বিপশ্যনা সাধন বা বিদর্শন সাধনা। সাধক এই বর্তমান মুহূর্তে যা কিছু অনুভব করবেন তারই প্রতি সজাগ থাকার, স্মৃতিমান থাকার অভ্যাস করেন। নিজের শরীরের প্রতি সজাগ থাকাকালীন **কায়ানুপশ্যনা** করেন। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে অনুভূত সমস্ত সুখদ-দুঃখদ অথবা অসুখদ-অদুঃখদ সংবেদনা সমূহের প্রতি সজাগ থেকে **বেদনানুপশ্যনা** করেন। নিজের চিত্তের প্রতি সজাগ থেকে **চিত্তানুপশ্যনা** করেন। চিত্তে উৎপন্ন বিভিন্ন ভাল-মন্দ বৃত্তিগুলোর প্রতি এবং সেগুলোর গুণ, ধর্ম, স্বভাবের প্রতি সজাগ থেকে এবং পরিশেষে কায়, বেদনা, চিত্ত ও চিত্তবৃত্তিসমূহের পরিসীমার উর্ধ্বে নির্বাণধর্মের সাক্ষাৎ করে **ধর্মানুপশ্যনা** করেন। জাগরুকতার অর্থাৎ সর্বক্ষণ সজাগ থাকার এই অভ্যাস সাধকের চিত্তে উৎপন্ন সমস্ত অকুশল বিকার ও সংস্কার সমূহকে উচ্ছেদ করে। চিত্ত ধীরে ধীরে আসক্তি, আস্রব, ব্যসন, তৃষ্ণা এবং তীব্র লালসার বন্ধন থেকে, অতীতের সুখদ-দুঃখদ স্মৃতির নিরর্থক রোমন্থন থেকে, ভাবী আশংকার ভয়-ভীতিজনিত মানসিক উৎপীড়ন থেকে, ভবিষ্যতের রঙীন স্বপ্নের কাল্পনিক ধ্যান থেকে, মুক্ত হয় নিজের স্বাভাবিক নৈসর্গিক স্বচ্ছতা লাভ করে।

সমস্ত দম্ভ-মানপূর্ণ গ্রন্থিসমূহ এবং উদ্বেগ-উত্তেজনাপূর্ণ মানসিক পীড়াসমূহকে দূর করার এটা একটা সহজ সরল উপায়—যা মানবমাত্রেরই জন্য সমানভাবে কল্যাণকারী। এর অভ্যাস করার জন্য এটা অনিবার্য নয় যে, এই বিধির প্রবর্তক ভগবান বুদ্ধের মূর্তিকে প্রণাম করতে হবে। তাকে ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য এবং আরতির দ্বারা পূজা করতে হবে। এটারও প্রয়োজন নেই যে, সাধক সেই আদি গুরুর রূপ বা আকারের ধ্যান করবেন অথবা তাঁর নাম বা মন্ত্রের জপ করবেন।

এটাও নয় যে, তাঁর শরণ গ্রহণ করার নামে অন্ধভাবে তাঁতে আত্মসমর্পণ করবেন—নিজে কিছু না করে কেবল তাঁরই কৃপাতে 'তরে যাব' এইরূপ মিথ্যা ভ্রান্তি যেন মাথায় চেপে না বসে। তবে এই বিধির দ্বারা স্বয়ং লাভবান হয়ে অথবা অন্যদের লাভবান হোতে দেখে যদি কোন সাধক সেই মহাকারুণিক মহাপ্রজ্ঞাবান ভগবান তথাগত বুদ্ধের প্রতি কৃতজ্ঞতাবিভোর হয়ে তাঁর করুণা এবং প্রজ্ঞার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন তো কোন দোষ নেই। গুণের প্রতি প্রকটিত শ্রদ্ধা ঐ গুণকে নিজের জীবনে ধারণ করার প্রেরণা দেয়। অতএব সেই শ্রদ্ধা কল্যাণকারিণী। এইরূপ কৃতজ্ঞতাও চিত্তের এক মঙ্গলময়ী সদ্‌বৃত্তি। শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতার ভাবনা চিত্তকে মৃদু করে যা বিদর্শন সাধনার এই চিত্তবিশুদ্ধি করণের প্রয়াসে সহায়ক হয়।

বিদর্শন সাধনা কায় এবং চিত্তের প্রকৃতির যথার্থ স্বরূপের প্রতি সজাগ থাকতে শিক্ষা দেয়। প্রকৃতির যথার্থ স্বরূপ দর্শনের এই অভ্যাস কোন বর্ণ, সম্প্রদায়, জাতি, দেশ, কাল বা বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতির জন্য কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না। মানব নিজেই মানবীয় প্রকৃতিকে স্বয়ং অধ্যয়ন করে। আত্মদর্শন করে। আত্ম-নিরীক্ষণ করে। নিজের অভ্যন্তরে সুপ্ত ক্লেশ-মালিন্যকে যথাভূত দর্শন করে। নিজের মনোবিকারসমূহকে যথার্থ অবলোকন করে। এইভাবে দেখতে দেখতে সমস্ত মনোবিকার দূর হয়ে যায় এবং সাধক যথার্থ 'উত্তম মানব' হয়ে প্রকৃত মানবীয় ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়। এইরূপ উত্তম জীবনের দ্বারা কোন জাতি, বর্ণ বা সম্প্রদায়েরই নয়, সমগ্র মানব সমাজের গৌরব সাধিত হয়। স্বয়ং তো সুখ-শান্তিতে থাকে, নিজের সম্পর্কে আগত অন্য সকলের সুখ-শান্তি বৃদ্ধির পথেও সহায়ক হয়।

সদ্ধর্মের এই সার্বজনীন, সার্বদেশিক, সার্বকালিক এবং সর্বহিতকারী স্বরূপ অধিক থেকে অধিক মাত্রায় লোকেরা উপলব্ধি করুক এবং তাঁদের হিত-সুখের কারণ হোক—এটাই মঙ্গল কামনা।

১১· ধর্মই রক্ষক

নিজের ভবিষ্যতের সুরক্ষার জন্য চিন্তিত থাকা মানুষের মনের স্বভাব হয়ে গেছে। আগামী মুহূর্ত সুখদ হোক, যোগক্ষেমের দ্বারা পরিপূর্ণ হোক—এইজন্য মানব শরণ খোঁজে, আশ্রয় সন্ধান করে, অবলম্বন চায়। কিন্তু ধর্মকে বাদ দিয়ে কোন শরণ, আশ্রয় বা অবলম্বন নেই—ধর্মই মানুষকে ভবিষ্যতের প্রতি নিঃশংক ও নির্ভর করে, যোগক্ষেমের দ্বারা পরিপূর্ণ করে। অতএব ধর্মের শরণই একমাত্র শরণ। ধর্মের সংরক্ষণই যথার্থ সংরক্ষণ। ধর্ম হচ্ছে সেটা যা আমাদের ভেতরে জাগে এবং যাকে আমরা স্বয়ং ধারণ করি। অন্য কারও ভেতরে যে ধর্ম জেগেছে, অন্য কেউ যাকে ধারণ করেছে— সেই ধর্ম আমাদের কোন কাজে আসবে? সেটা বরং আমাদের অধিকতর প্রেরণা এবং বিধি প্রদান করতে পারে। কিন্তু আমাদের বাস্তবিক লাভ তো ধর্ম ধারণ করার মধ্যেই। অতএব ধর্মশরণের যথার্থ অভিপ্রায় হচ্ছে আত্মশরণ। সেইজন্য বলা হয়েছে—**অত্তসম্মাপণিধি চ এতং মঙ্গলমুত্তমং**। অর্থাৎ আমাদের উত্তম মঙ্গল এই কথার মধ্যে নিহিত যে আমাদের সম্যক্ প্রকার আত্ম প্রণিধানের অভ্যাস করতে হবে। কোনও বাহ্যশক্তির প্রণিধানের অভ্যাস আমাদের ভীত, পরাশ্রয়ী এবং অসমর্থ করে দেয়। আত্মদ্বীপ এবং আত্মশরণই যথার্থ অর্থে ধর্মদ্বীপ এবং ধর্মশরণ। যে কোন সংকটে আমাদের ভেতরের ধর্মকে জাগাতে হবে। স্বয়ং ধারণ করা ধর্মের দ্বারা এমন এক সুরক্ষিত দ্বীপ আমরা বানাতে পারি যাতে আমাদের জীবনের দোদুল্যমান নৌকা যথার্থ আশ্রয় পেতে পারে, যে কোন বিপদ-আপদের প্রতি আমাদের সুরক্ষা স্থির হতে পারে।

আসল কথা হচ্ছে এই যে, আমাদের নিজের ভেতরের প্রজ্ঞাকে জাগিয়ে রাখতে হবে এবং এইজন্য সমাধির দ্বারা নিজের চিত্তের একাগ্রতাকে পুষ্ট রাখতে হবে; কায়িক, বাচিক দুষ্কর্ম থেকে রক্ষা পাবার জন্য নিজের শীল অখণ্ডিত রাখতে হবে। শীল, সমাধি এবং প্রজ্ঞার এই বিশুদ্ধ ধর্ম আমরা যতটা সুরক্ষিত রাখবো অর্থাৎ আমরা যতটা ধর্মবিহারী হতে পারবো, স্বয়ং পালন করা, স্বয়ং ধারণ করা, স্বয়ং সুরক্ষিত করা ধর্মের দ্বারা ততটা নিজের সুরক্ষণ ও সংরক্ষণ লাভ করবো। বাস্তবিক **"ধম্মো হবে রক্খতি ধম্মচারিং"**—ধর্মচারীর রক্ষা স্বয়ং ধর্মই করে। তাহলে নিজের যথার্থ সুরক্ষার জন্য স্বয়ং প্রকৃত ধর্মচারী ধর্মবিহারী এবং ধর্মপালনক হোন। এতেই আমাদের মঙ্গল, ভাল এবং কল্যাণ নিহিত আছে।

১২. 'নাম'-এ কি আছে?

অতীতের কথা। কোন ব্যক্তির মা-বাবা তাঁর নাম রেখেছিলেন 'পাপক'। সে যখন বড় হোল, তখন ঐ নামটা তার ভীষণ খারাপ লাগতে লাগলো। তখন সে আচার্যের কাছে প্রার্থনা করল—ভন্তে, আমার নাম বদলে দিন। এই নাম খুব অপ্রিয়, কারণ এটা অশুভ, অমাঙ্গলিক এবং দুর্ভাগ্যসূচক। আচার্য তাঁকে বোঝালেন—দেখ, নাম হচ্ছে একটা 'প্রজ্ঞপ্তি'মাত্র। ব্যবহার জগতে কাউকে ডাকার জন্য এই নামের প্রয়োজন। নাম পালটালে কোন মতলব সিদ্ধ হবে না। কারও নাম 'পাপক' থাকলেও সৎকর্মের দ্বারা সে 'ধার্মিক' হতে পারে। আবার কারও নাম 'ধার্মিক' থাকলেও দুষ্কর্মের ফলে সে 'পাপক' (পাপী) হতে পারে। আসল কথা হচ্ছে কর্মের। নাম পালটালে কি হবে?

কিন্তু তিনি কিছুতেই শুনলেন না! বারবার আচার্যকে অনুরোধ করতে লাগলেন। আচার্য তখন বললেন—কর্মশুদ্ধির দ্বারাই অর্থসিদ্ধি হয়, মঙ্গল হয়। তুমি যদি নামও শুদ্ধ করতে চাও তাহলে যাও, গ্রামে-নগরে যে ব্যক্তির নাম তোমার মাঙ্গলিক মনে হবে, আমাকে এসে জানাবে। তোমার নাম সেভাবেই পালটে দেওয়া হবে।

পাপক সুন্দর নামধারী লোকদের খুঁজতে বেরিয়ে পড়লেন। বাড়ী থেকে বের হওয়া মাত্রই তিনি এক শব-যাত্রা দেখলেন। জিজ্ঞেস করলেন কে মারা গেছে? লোকেরা বললো—জীবক। পাপক তখন ভাবতে লাগলেন—নাম তার জীবক, কিন্তু সে মৃত্যুর শিকার হল কেন?

আরও যেতে যেতে দেখলেন কোন দীন-দরিদ্র দুঃখী তার স্ত্রীকে মারধোর করে ঘর থেকে বের করে দিচ্ছে। তাঁর নাম জিজ্ঞেস করে জানলেন—ধনপালী। পাপক ভাবতে লাগলেন—নাম তার ধনপালী অথচ কপর্দকশূন্য?

আরও যেতে যেতে দেখলেন—এক ব্যক্তি পথ হারিয়ে ফেলে লোকজনকে পথের নিশানা জিজ্ঞেস করছেন। তিনি তাঁর নাম জিজ্ঞেস করে জানলেন—পন্থক। পাপক তখন আরও চিন্তায় পড়লেন—আরে! পন্থকও পন্থা (রাস্তা) জিজ্ঞেস করছে! পথিকও পথ হারায়!

পাপক ফিরে এলেন।—নামের প্রতি তাঁর আর কোন আকর্ষণ বা বিকর্ষণ রইল না। তিনি সব বুঝতে পারলেন। 'নাম'-এ কি আছে? জীবকও মরে অজীবকও মরে। ধনপালীও দরিদ্র হয়, অধনপালীও। পন্থকও পথ ভোলে, অপন্থকও। বাস্তবিক নামের তো কোন মাহাত্ম্যই নেই। যে জন্মান্ধ তারও নাম 'নয়নসুখ'। জন্ম থেকে যে দুঃখী তারও নাম 'সদাসুখ'। আমার নাম 'পাপক', কিন্তু আমার তো অমঙ্গল কিছু দেখছিনা? অতএব নাম কিছুই নয়। আমি নিজের কর্মই শুদ্ধ করবো। কর্মই প্রমুখ। কর্মই প্রধান।

যে কথা ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেও তাই প্রযোজ্য। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সমস্ত লোকই কি বোধিসম্পন্ন? জৈন-সম্প্রদায়ের সমস্ত লোকই

কি—আত্মজিত? ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের সমস্ত লোকই কি ব্রহ্মবিহারী? ইসলাম-সম্প্রদায়ের সমস্ত লোকই কি আত্মসমর্পিত এবং শান্ত? প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যেই যেমন ভাল-মন্দ, আছে, তদ্রুপ প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যেও ভাল-মন্দ লোক আছে। কোন সম্প্রদায়ের সব লোকই ভাল হতে পারে না আবার সব লোকই খারাপ হতে পারে না। কিন্তু সাম্প্রদায়িক আসক্তির কারণে আমরা নিজের সম্প্রদায়ের প্রত্যেক ব্যক্তিকে সজ্জন এবং অন্য সম্প্রদায়ের প্রত্যেক ব্যক্তিকে দুর্জন মনে করি। বৌদ্ধ, জৈন, খৃষ্টান বা মুসলিম বলা মাত্রই কোন ব্যক্তি সজ্জন বা দুর্জন হতে পারে না। বৌদ্ধ নামধারী ব্যক্তি পরম পূণ্যবানও হতে পারে অথবা নিতান্ত পাপীও হতে পারে। এই কথা সকল সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য। যেমন কোন ব্যক্তিকে চেনবার জন্য তাকে একটা নাম দেয়া হয়, সেইরূপ কোন সম্প্রদায়কে চেনার জন্য একটা নাম দেয়া হয় মাত্র। নামের সঙ্গে গুণের কোন সম্বন্ধ নেই। তেলভরা টিনের গায়ে 'ঘি' এর লেবেল লাগিয়ে দিলেও তেল তেলই থাকে; বিশুদ্ধ ঘি হয়ে যায় না। কোন সুন্দর ব্যক্তির নাম 'কুরূপ' রাখলে সে কুরূপ হয়ে যায় না, কোন কুরূপ ব্যক্তির নাম 'সুন্দর' রাখলেও সে সুন্দর হয়ে যায় না। ফুলকে কাঁটা অথবা কাঁটাকে ফুল বলতে থাকলেও ফুল ফুলই থাকে, কাঁটা কাঁটাই থাকে।

কোন ব্যক্তি হয়ত দীন-দরিদ্র, কিন্তু তার নাম 'রাজন্য'। এই ব্যক্তি যতদিন বুঝবে যে তার 'রাজন্য' নাম কেবল সম্বোধনের জন্য, আসলে সে দরিদ্র, ততদিন সে সজ্ঞানে আছে বলতে হবে। কিন্তু যেদিন সে ঐ নামের দম্ভ মাথায় চাপিয়ে দীন-দরিদ্র হয়েও নিজেকে প্রতাপশালী রাজা এবং অন্য সকলকে হেয় দৃষ্টিতে দেখতে সুরু করবে, তখন তাকে পাগল ছাড়া কেউ বলবে না। লোকের উপহাসের পাত্রই সে হবে। কিন্তু 'রাজন্য' নামধারী হাজার-লক্ষ দীন-দরিদ্র সংগঠিত হয়ে নিজেকে 'রাজা' বলে মনে করতে থাকে এবং অন্য সকলকে হেয় দৃষ্টিতে দেখতে থাকে, তাহলে পাগলদের এই পাগলামী কেবল উপহাসাস্পদই নয়, বরং গোটা সমাজের পক্ষেই বিপদের কারণ হয়। ঠিক এইদশা আমাদের হয়, যখন আমরা জাতীয়তা, সাম্প্রদায়িকতা বা রাষ্ট্রীয়তার ইন্ধন যোগিয়ে প্রমত্ত হয়ে উঠি এবং নিজেই নিজেকে অন্যদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলে মনে করতে থাকি এবং অন্যদের ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখতে থাকি। এই অবস্থায় আমরাও গোটা সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক এবং অশান্তির কারণ হয়ে থাকি। ফলে নিজের বিপদ নিজে ডেকে আনি, নিজের অশান্তি নিজে সৃষ্টি করি। সুখশান্তি হারিয়ে প্রকৃত ধর্ম থেকে দূরে সরে যাই।

ধর্মকে জাতি, বর্ণ, বর্গ, সমুদায়, সম্প্রদায়, দেশ, রাষ্ট্রের সীমাতে বাঁধা যায় না। মানব সমাজের যে কোন শ্রেণীতে ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি থাকতে পারে। ধর্মের উপর কোন এক বর্ণবিশেষেরই একচ্ছত্রাধিকার থাকতে পারে না। **ধর্ম আমাদের 'ভাল মানুষ' হতে শিক্ষা দেয়। ভাল মানুষ ভাল মানুষই। সে শুধুমাত্র নিজের**

সম্প্রদায়ের নয়, বরং সারা মানব সমাজের শোভা। যে ভাল মানুষ নয় সে ভাল হিন্দু বা মুসলমান, ভাল বৌদ্ধ বা জৈন, ভাল ভারতীয় বা বর্মী, ভাল ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় কিভাবে হবে? আর যে ভাল মানুষ হয়েছে সে যথার্থ অর্থে ধর্মবান। তাকে যে নামেই ডাকা হোক না কেন, কিছু এসে যাবে না। গোলাপ গোলাপই থাকে। নাম পালটে দিলেও তার গুণের কোন তারতম্য হয় না। যে বাগানে গোলাপ ফুটবে কেবল সেই বাগানকেই নয়, আশপাশের সারা বায়ুমণ্ডলকেই নিজের সৌরভে সুরভিত করে। অতএব আসল কথা হচ্ছে, আমাদের ধর্মপরায়ণ হতে হবে। ভাল মানুষ হতে হবে। নাম যাই হোক না কেন। যে বাগানই হোক না কেন, তাতে যে নামেরই বোর্ড লাগানো হোক না কেন—কিছু এসে যায় না। সেখানে ফুল ফুটতে হবে, ফুলের সৌরভ ছড়াবে—তা না হলে সেই বাগানের কোন সার্থকতা নেই।

সাম্প্রদায়িকতা এবং জাতীয়তার রঙীন চশমা খুলে ফেলে দেখলেই ধর্মের শুদ্ধ রূপ প্রকটিত হবে। অন্যথা নিজের সম্প্রদায়েরই রঙ্-চাকচিক্য নামলেবেলই প্রাধান্য পেয়ে যাবে। ফলে ধর্মের সার গুরুত্ববিহীন হয়ে যাবে। ধর্মের কষ্টিপাথরে কোন ব্যক্তিকে পরীক্ষা করতে হলে এটা দেখা উচিত নয় যে সে কোন সম্প্রদায়ে দীক্ষিত? অন্যথা কোন দার্শনিক মান্যতাকে মেনে চলে? অথবা কি কি সংস্কার পালন করে? বরং এটা দেখা উচিত যে তার আচরণ কিরূপ? জীবন-ব্যবহার কিরূপ? ভাল না মন্দ? কুশল না অকুশল? সেটা পবিত্র কিনা, শুদ্ধ কিনা? আত্মমঙ্গলকারী এবং লোকমঙ্গলকারী কিনা? যদি হয়, তাহলে সে যথার্থই ধর্মবান। যতটুকু আছে ততটুকুই ধর্মবান। যদি না থাকে, তাহলে ধর্মের সঙ্গে সেই ব্যক্তির কোন সম্বন্ধ নেই। সে যে নামেই পরিচিত হোক না কেন, যে সম্প্রদায়েরই হোক না কেন, যে তক্‌মাই লাগিয়ে চলুক না কেন। এই সাম্প্রদায়িক তক্‌মার সঙ্গে ধর্মের কিই বা সম্বন্ধ! চমকদার নাম এবং তক্‌মা থেকে আমরা কিই বা পেতে পারি! কারও কোন কিছু পাওয়া সম্ভব কি? মদে ভরা বোতলে দুধের লেবেল লাগানো থাকলেও সেটা পান করলে আমাদের নেশাই হবে। যদি তাতে জল ভরা থাকে, তাহলে সেটা পান করে তেষ্টা মেটানো যেতে পারে, কিন্তু স্বাস্থ্যবান হওয়া যাবে না। স্বাস্থ্যবান হতে হলে বিশুদ্ধ দুধ পান করতে হবে। বোতলের রং-রূপ বা লেবেল যাই হোক না কেন—কিছু এসে যায় না। এই 'নাম' আর 'লেবেল'এ কি আছে? সাম্প্রদায়িকতা, জাতীয়তা এবং রাষ্ট্রীয়তার ভূত মাথায় চেপে বসলে কেবল বোতল এবং বোতলের নাম এবং লেবেলই মুখ্য আকার ধারণ করে, দুধ গৌণ হয়ে যায় ধর্ম গৌণ হয়ে যায়।

আপনারা আসুন, এই নাম এবং লেবেলের ঊর্ধ্বে উঠে নিজেদের আচরণ শুদ্ধ করুন। বাক্ সংযম করার জন্য মিথ্যা, কর্কশ, চুক্‌লি, নিন্দা এবং নিরর্থক প্রলাপ থেকে নিজেকে বাঁচান। শরীরকে সংযত করার জন্য হিংসা, চুরি, ব্যভিচার

এবং নেশাপান থেকে নিজেকে রক্ষা করুন। নিজের জীবিকা শুদ্ধ করুন, জন-অহিতকারী ব্যবসা থেকে নিজেকে বাঁচান। মনকে সংযত করার জন্য তাঁকে নিজের বশে রাখতে শিখুন। তাকে সতত সাবধান সজাগ হয়ে থাকার অভ্যাস করাতে হবে এবং প্রতিমূহূর্তে ঘটমান ঘটনাকে 'যেমন যেমন' ভাবে সাক্ষীভাবে দেখতে পারার সামর্থ্য বাড়িয়ে পরিশেষে রাগ, দ্বেষ এবং মোহগ্রন্থিকে দূর করুন। চিত্তকে নির্মল করুন—তাকে অনন্ত মৈত্রী এবং করুণার দ্বারা পূর্ণ করুন। নাম-লেবেলবিহীন ধর্মের ইহাই মঙ্গলবিধান।

১৩· সত্য ধর্ম

সত্যধর্মের আলো জ্বলতে সুরু করেছে। পাপের অন্ধকার দূর হবার সময় নিকটবর্তী। এই মঙ্গময় ধর্মবেলায় লাভের অংশীদার হোন এবং নিজের অন্তরকে ধর্মের প্রকাশে উদ্দীপিত করুন। নিজের ভেতরে সঞ্চিত সমস্ত অন্ধকার, সমস্ত কলুষ দূর করুন।

আমাদের অর্ন্তমনের গভীরে যে রাগ, দ্বেষ আর মোহ সঞ্চিত আছে, তাকে দূর করুন। রাগ, দ্বেষ এবং মোহই পাপের অন্ধকার। এগুলোকে সরাতে পারলেই ধর্মের প্রকাশ হবে। আমরা বড়ই ভাগ্যবান যে এইরূপ সহজ-সরল বিধি আমরা লাভ করেছি, যার দ্বারা আমরা নিজের অন্তর্মনকে ধুয়ে সত্যধর্মের পবিত্রতাকে ধারণ করতে পারি। এই সুযোগের পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করুন।

এই পথে চলতে হলে এটা কখনও অনিবার্য নয় যে কেউ নিজেই নিজেকে বৌদ্ধ বলতে সুরু করবেন। বৌদ্ধ বলুন বা না বলুন, কিন্তু যেদি আমরা সেই মহাকারুণিক ভগবান তথাগতের দ্বারা প্রদর্শিত সহজ সরল পন্থাকে নিজস্ব করে নিজের ভেতরের রাগ, দ্বেষ মোহের কলুষকে দূর করতে পারি, তাহলে নিশ্চয়ই এর দ্বারা আমাদের লাভ হবে। আমাদের হিত-সুখ হবে। তখন আমরা নিজেদের যে নামেই ডাকিনা কেন, আমরাই কল্যাণকারী মার্গের যথার্থ অনুগামী, দুঃখ-নিরোধগামিনী প্রতিপদার যথার্থ পথিক এবং সকল দুঃখকে দূর করার যথার্থ অধিকারী।

সত্যধর্মের অভাবেই আমরা উঁচু-নীচু দেয়াল বানিয়ে মানুষ-মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছি। সত্য ধর্ম এই দেয়ালগুলোকে ভেঙে সকল প্রকার বিভেদ মিটিয়ে দেয় এবং একতার ধরাতলে এইরূপ মানবীয় সমাজ গঠন করে। সেখানে জন্ম-জাত উঁচু-নীচুর ভেদভাব থাকে না। হ্যাঁ, যদি কোন ভেদভাব থাকে, তাহলে সেটা হচ্ছে কে কতটা শীলবান, সমাধিবান এবং প্রজ্ঞাবান? কিন্তু এই বিভেদও স্থায়ী শাশ্বত নয়, কোন বাহ্য শক্তির দ্বারা পূর্বনিশ্চিত বা পূর্বনির্ধারিত নহে। প্রত্যেক মানুষ একথা বলার ক্ষমতা রাখে যে সে নিজের সৎ প্রযত্নের দ্বারা অধিকতর শীলবান হয়ে কায়িক এবং বাচিক দুষ্কর্ম থেকে রক্ষা পাবে, অধিকতর সমাধিবান হয়ে নিজের মনকে বশীভূত করবে, এবং অধিকতর প্রজ্ঞাবান হয়ে রাগ, দ্বেষ এবং মোহরূপী চিত্তমালিন্য থেকে মুক্তি পাবে। 'সমতা' যার লাভ হয়নি তার 'সমতা' লাভ করার পুরোপুরি অধিকার আছে, পুরোপুরি সুযোগ আছে।

শীল, সমাধি এবং প্রজ্ঞাতে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি স্বভাবতই মৈত্রী এবং করুণার শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর দ্বারা পরিপ্লাবিত হয়ে ওঠেন। তাঁর মনে দ্বেষ এবং দৌর্মনস্য, অহংকার এবং ঘৃণা, ভয় এবং ভীতি থাকতে পারে না। তিনি জাতি বর্ণ কুল এবং ধনের কারণে অহং-ভাবনার শিকার হন না, অথবা ওগুলোর অভাবে কোন হীন-ভাবনারও শিকার হন না। কোন ব্যক্তি যে কোন জাতি, কুল, বর্ণ বা

সম্প্রদায়ে জন্মগ্রহণ করুন না কেন, তিনি ধনবান হোন বা নির্ধন হোন, বিদ্বান হোন বা মূর্খ হোন—যদি শীল, সমাধি এবং প্রজ্ঞায় তিনি প্রতিষ্ঠিত থাকেন, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই পূর্ণ মানব, অতএব মহান্।

মানবতার এই যথার্থ মানদণ্ডে নিজে নিজেকে মাপতে থাকার অভ্যাস বাড়ান, এবং যখন নিজের শীল, সমাধি এবং প্রজ্ঞায় কোন দৌর্বল্যও কখনও দেখা যায়, তাহলে সেই দৌর্বল্যকে দূর করে শীল-সমাধি-প্রজ্ঞার পুষ্টিসাধনে যত্নবান হোন, এবং এইভাবে নিজের যথার্থ কল্যাণ সাধন করুন।

১৪· বিপশ্যনা (বিদর্শন) কি?

বিপশ্যনা (বিদর্শন)-কে জানুন। ভাল করে না বুঝলে যথার্থ বিপশ্যী (বিদর্শক) হতে পারবেন না।

বিপশ্যনা বা বিদর্শন কোন যাদু নয়, যা আমাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতে সক্ষম হবে। বিপশ্যনা কোন সম্মোহনী বিদ্যা নয়, অন্য কারও দ্বারা সম্মোহিত হয়ে যাতে আমরা নিজেদের জ্ঞানবুদ্ধি হারিয়ে বসি। বিপশ্যনা কোন মন্ত্রশক্তি নয়, যা আমাদের রক্ষা করতে পারে, যেমন সাপ-বিছে, ভূত-প্রেত থেকে মন্ত্র রক্ষা করে। বিপশ্যনা কোন অন্ধভক্তি বা অন্ধ ভাবাবেশ নয়, যার ভাবোন্মাদনায় আমরা উন্মত্ত হয়ে থাকতে পারি। বিপশ্যনা কোন ভজন কীর্তন, সঙ্গীত বা নৃত্য নয় যাতে ভাববিভোর হয়ে আমরা আত্মবিস্মৃত হয়ে থাকতে পারি। বিপশ্যনা কোন ঋদ্ধি বা অলৌকিক কিছু নয় যার চমৎকারিত্বে চমৎকৃত হয়ে আমরা বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে থাকতে পারি। বিপশ্যনা শব্দসমূহের ইন্দ্রজালের কোন মায়া নয়, যাতে কারও বাণীবিলাস দ্বারা আমরা নিজেদের বুদ্ধিবিলাস করে থাকতে পারি। বিপশ্যনা কোন দার্শনিক কচকচি নয়, যাতে কসরত করতে করতে আমরা মশগুল হয়ে থাকতে পারি। বিপশ্যনা কোন আখড়া নয়, যাতে আমরা বাদী-বিবাদী, তর্ক-বিতণ্ডায় বচনের খাল সেচন করতে করতে বুদ্ধির খেলায় একে অন্যকে বিভ্রান্ত করতে পারি। বিপশ্যনা কোন বিশিষ্ট বেশভূষা নয়, যা পরিধান করে আমরা নিজেদের ধার্মিক বলে জাহির করতে পারি। বিপশ্যনা কোন রূঢ়ি বা কর্মকাণ্ড নয় যাকে অবলম্বন করে আমরা ধর্মের নামে আত্ম-ছলনা করে থাকতে পারি। বিপশ্যনা কোন গ্রন্থপাঠ নয় যাকে ভেলা করে আমরা সংসারের বৈতরণী পার হবার স্বপ্ন দেখতে পারি। বিপশ্যনা কোন কাল্পনিক ত্রাণকর্তা দেব ব্রহ্মা বা কোন দাম্ভিক ধর্মাচার্যের মিথ্যা আশ্বাস নয়, যা ডুবন্ত লোকের তৃণ অবলম্বনের ন্যায় আমাদের সহায়ক হতে পারে। তাহলে বিপশ্যনা কি?

বিপশ্যনা হচ্ছে সত্যের উপাসনা। সত্যের মধ্যে বাঁচার প্রয়াস আছে। সত্য হচ্ছে যথার্থ। যথার্থ কেবল এই বর্তমান মুহূর্তেরই হতে পারে। অতীতের হচ্ছে স্মৃতি, ভবিষ্যতের হচ্ছে কামনা—কল্পনা। কিন্তু বাস্তবিকতা এই বর্তমান মুহূর্তেরই হয়। অতএব বিপশ্যনা হচ্ছে এই বর্তমান মুহূর্তে বাঁচার প্রয়াস। এই বর্তমান মুহূর্ত যাতে ভবিষ্যতের কোন কল্পনা নেই। অতীতের জল্পনার আকুলতা অথবা ভবিষ্যতের স্বপ্নের ব্যাকুলতা এতে নেই। আবরণ, মায়া, বিপর্যয়, ভ্রম-ভ্রান্তি-বিহীন এই বর্তমান মুহূর্তের যা সত্য, যা যেমনটি আছে তাকে ঠিক তেমনভাবে দেখা এবং বোঝাই হচ্ছে বিপশ্যনা। বিপশ্যনা হচ্ছে সম্যগ্ জ্ঞান।

বিপশ্যনা হচ্ছে সত্যের উপাসনা। সত্যের মধ্যে বাঁচার প্রয়াস আছে। সত্য হচ্ছে যথার্থ। যথার্থ কেবল এই বর্তমান মুহূর্তেরই হতে পারে। অতীতের হচ্ছে স্মৃতি, ভবিষ্যতের হচ্ছে কামনা—কল্পনা। কিন্তু বাস্তবিকতা এই বর্তমান মুহূর্তে বাঁচার প্রয়াস। এই বর্তমান মুহূর্তে যাতে ভবিষ্যতের কোন কল্পনা নেই। অতীতের

জল্পনার আকুলতা অথবা ভবিষ্যতের স্বপ্নের ব্যাকুলতা এতে নেই। আবরণ, মায়া, বিপর্যয়, ভ্রম-ভ্রান্তি-বিহীন এই বর্তমান মুহূর্তের যা সত্য, যা যেমনটি আছে তাকে ঠিক তেমনভাবে দেখা এবং বোঝাই হচ্ছে বিপশ্যনা। বিপশ্যনা হচ্ছে সম্যগ্ জ্ঞান।

যেটা যেমন তাকে ঠিক তদ্রুপ দর্শন করে এবং বুঝে যে আচরণ হবে তাই যথার্থ আচরণ, কল্যাণকারী সম্যক্ আচরণ। বিপশ্যনা হচ্ছে সম্যগ্ আচরণ ।

বিপশ্যনা পলায়ন নহে, জীবন-বিমুখতা নহে, বরং জীবন-অভিমুখী হয়ে বাঁচার প্রণালী। বিপশ্যনা যেন খোলা হাওয়ায় ধরিত্রীর উপর কদম রেখে চলার শৈলী। বিপশ্যনা বুদ্ধি-বিলোপ নহে, বরং শুদ্ধ ধর্মশীলের জীবনে প্রবেশের বিধি। বিপশ্যনা নিজ এবং সর্ব মঙ্গলময়ী আচার-সংহিতা। স্বয়ং সুখে বাঁচা এবং অন্যদের সুখে বাঁচতে দেবার কল্যাণকারিণী জীবনপদ্ধতি। বিপশ্যনা হচ্ছে আত্মমঙ্গল এবং সর্বমঙ্গল। বিপশ্যনা হচ্ছে আত্মোদয় এবং সর্বোদয়।

বিপশ্যনা হচ্ছে আত্মনির্ভরতা। কারও সাহায্য ব্যতিরেকে নিজের পায়ে দাঁড়াবার মঙ্গলবিধি। স্বাবলম্বনের সর্বোৎকৃষ্ট সাধন। বিপশ্যনা হচ্ছে আত্মদর্শন, আত্মনিরীক্ষণ এবং আত্মপরীক্ষণ। নিজের ভেতরের কতটা (চিত্ত) ময়লা বের হল? কতটা বাকী আছে? কতটা নির্মলতা এল? কতটা বাকী আছে? কতটা দুর্গুণ দূর হয়েছে? কতটা বাকী আছে? কতটা সদ্গুণ এল? কতটা বাকী আছে? স্বয়ং নিজেকে সর্বতোভাবে দেখার জাগরুকতাই বিপশ্যনা। স্বয়ং চোর, স্বয়ং পাহারাদার। স্বয়ং রোগী, স্বয়ং চিকিৎসক। অজ্ঞান থেকে জ্ঞান, ময়লা থেকে নির্মলতা, রোগ থেকে আরোগ্য, দুঃখ থেকে দুঃখমুক্তির দিকে ক্রমশঃ এগিয়ে যাওয়ার প্রয়াসই বিপশ্যনা। বিপশ্যনা সেই প্রয়াস এবং সেই প্রযত্ন যার অন্য নাম সম্যক্ অভ্যাস এবং সম্যক্ ব্যায়াম।

বিপশ্যনা হচ্ছে আত্মসংবর। নিজের মনে ময়লা উৎপন্ন না হতে দেওয়ার সংবর। বিপশ্যনা হচ্ছে-নির্জরা—নিজের মনের পুরোনো ময়লা দূর করার নির্জরা বা উৎসাহ। নতুন ময়লা অন্য কিছু নয়, আমরা স্বয়ং মোহবিমূঢ় হয়ে যা উৎপন্ন করে থাকি। অতএব স্বয়ং প্রযত্নপূর্বক সতত জাগরুক থেকে নতুন ময়লা উৎপন্ন হতে না দেওয়াই বিপশ্যনা। পুরোনো ময়লাও অন্য কারও দ্বারা সঞ্চিত করা হয়নি। প্রমাদবশতঃ আমরাই স্বয়ং সৃষ্টি করেছি। অতএব একে দূর করার সম্পূর্ণ দায়িত্বও নিজের, অন্য কারও নয়। অতএব নিজের পুরোনো ময়লাকে নিজেই দূর করতে সচেষ্ট থাকাই বিপশ্যনা । ধীর শান্ত হয়ে প্রযত্নপূর্বক অল্প অল্প ময়লা দূর করতে থাকলে একদিন পূর্ণ নির্মলতা প্রাপ্ত হওয়া যাবেই, মন নির্মল হলে সদ্গুণের দ্বারা পূর্ণ হয়ে যাবে এবং দূষিত মনের দ্বারা উৎপন্ন সমস্ত শারীরিক রোগ, সমস্ত দুঃখ দূর হয়ে যাবে। বিপশ্যনা হচ্ছে আরোগ্যবর্ধিনী সঞ্জীবনী ঔষধি, চিত্তশোধনী ধর্মগঙ্গা, দুঃখনিরোধগামিনী প্রতিপদা, মুক্তিদায়িনী ধর্মবীথি।

বিপশ্যনা শীল এবং সমাধিতে স্থিত হয়ে অন্তঃপ্রজ্ঞা জাগ্রত করার অভ্যাস। আস্তে আস্তে প্রজ্ঞা পুষ্ট করার সৎ প্রয়াস। স্থিতপ্রজ্ঞ হওয়ার শুভ আয়াস। প্রত্যেক প্রত্যুৎপন্ন স্থিতিকে প্রকারে প্রকারে জানা, বিমোহিনী একান্তদৃষ্টি ত্যাগ করতঃ সত্যদর্শিনী অনেকান্ত দৃষ্টি দ্বারা যথার্থ সত্যকে সর্বাঙ্গীণ নিরীক্ষণ করা, সজাগ থেকে সত্যের যথার্থ স্বভাবের সাক্ষাৎকরণ—ইহাই বিপশ্যনা। বিপশ্যনা হচ্ছে নিঃসঙ্গ দর্শন নির্লিপ্ত নিরীক্ষণ এবং নিতান্ত অনাসক্তি।

অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে তাকে ঠিক ঠিক না দেখে না বুঝে সহসা অন্ধ প্রতিক্রিয়া করা হচ্ছে দুষ্প্রজ্ঞতা। ইহাই মানসিক ক্ষোভ, উত্তেজনা, বিকৃতি, অসাম্য, অশান্তি—অতএব দুঃখ। পরন্তু ঈদৃশ প্রত্যেক অবস্থাকে বিবেকপূর্বক দেখে উপলব্ধি করে নিজের মনের সমতা রক্ষা করাই হচ্ছে প্রজ্ঞা। আগত পরিস্থিতির সংযত চিত্তদ্বারা মোকাবিলা করাই ধর্মাচরণ, মঙ্গলাচরণ। ইহাই বিপশ্যনা। উৎপন্ন স্থিতিকে হঠাৎ দূর করার চেষ্টা থেকে রক্ষিত থেকে নিজে নিজেকে সংযত রাখা এবং তারপর শান্তিপূর্ণভাবে করণীয় সম্পাদন করা—ইহাই সম্যক্ জীবন-ব্যবহার। ইহাই বিদর্শন। অন্যদের বদলাবার প্রচেষ্টার পূর্বে নিজেকে বদলানোই হচ্ছে শুদ্ধচিত্তের ব্যবহারকৌশল। ইহাই বিদর্শন। বিদর্শন হচ্ছে আত্ম-সংযম, আত্ম-সমতা এবং আত্ম-সামায়িক।

বিদর্শন হচ্ছে আত্মশুদ্ধি, আত্মবিমুক্তি। বিকারমুক্ত শুদ্ধচিত্তে মৈত্রী এবং করুণার অজস্র ঝরণাধারা অনায়াসে ঝরতে থাকে। ইহাই মানব-জীবনের চরম উপলব্ধি, ইহাই বিদর্শন সাধনার চরম পরিণতি।

বিদর্শনের সিদ্ধি অবশ্যই কঠিন, কিন্তু অসম্ভব নহে। অবশ্যই ইহা কষ্টসাধ্য কিন্তু অসাধ্য নহে। বিদর্শন স্ব-প্রযত্নসাধ্য। কেবল একটি বা একাধিক বিদর্শন শিবিরে সম্মিলিত হলেই সব কিছু হবে না। ইহা আজীবন অভ্যাস ও চর্চার বিষয়। বিদর্শনের জীবন সর্বদাই যাপন করতে হবে। সর্বদা সজাগ, সচেষ্ট এবং যত্নবান হতে হবে।

অতএব, অদম্য উৎসাহের সঙ্গে বিদর্শনের মঙ্গলপথে এগিয়ে চলুন। চলতে গিয়ে বারবার আছাড় খেয়ে পড়লেও আবার দাঁড়াতে হবে, হাঁটু দুটোকে একটু মালিশ করে কাপড়-চোপড় ঝেড়ে আবার এগিয়ে যেতে হবে। প্রত্যেক স্খলন বা পতন পরবর্তী কদমকে আরও দৃঢ় করবে, প্রত্যেক ধাক্কা লক্ষ্যে পৌঁছবার পথে নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করবে। অতএব, দাঁড়িয়ে না থেকে, অপেক্ষা না করে এগিয়ে চলুন। কদম কদম আগে এগিয়ে চলুন। ইহাই যথার্থ মঙ্গলবিধান।

১৫· ধর্মচক্র

আমাদের ভেতরে প্রতি মুহূর্তে যে লোকচক্র চলছে তার থেকে মুক্তি পেতে হলে ধর্মচক্র প্রবর্তিত করতে হবে। লোকচক্র আমাদের যাবতীয় দুঃখের মূল। ধর্মচক্র সমস্ত দুঃখের নিরোধক।

লোকচক্র কি? লোকচক্র হচ্ছে মোহ, মূঢ়তা। লোকচক্র অজ্ঞান, অবিবেক এবং অবিদ্যা যার জন্য আমরা নিরন্তর রাগ, দ্বেষ এবং মোহের জাঁতায় পিষ্ট হচ্ছি। আমাদের ছয়টি ইন্দ্রিয়—চোখ, কাণ, নাক, জিভ, শরীরের ত্বক এবং মন। এগুলোর ছয়টি বিষয়—রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ এবং কল্পনা। ছয়টি ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে এই ছয়টি বিষয়ের পরস্পর সংস্পর্শ হতে থাকে। চোখের সঙ্গে রূপের, কাণের সঙ্গে শব্দের, নাকের সঙ্গে গন্ধের, জিভের সঙ্গে রসের, ত্বকের সঙ্গে স্পর্শের এবং মনের সঙ্গে কল্পনার। বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শ হওয়া মাত্রই চিত্তে কোন সংবেদনা (অনুভূতি) জাগে। যদি এই সংবেদনা আমাদের প্রিয় হয়, তাহলে তৎসম্বন্ধী বিষয় থেকে আমাদের রাগ বা আসক্তি উৎপন্ন হয়। যদি উক্ত সংবেদনা অপ্রিয় হয়, তাহলে আমাদের দ্বেষ বা বিদ্বেষ উৎপন্ন হয়। রাগ (বা আসক্তিই) উৎপন্ন হোক অথবা দ্বেষ উৎপন্ন হোক, দুটোই আমাদের মনে চাঞ্চল্য এবং উত্তেজনা সৃষ্টি করে। এতে সমতা নষ্ট হয়। বিষমতা উৎপন্ন হয়। দুঃখসন্ধি হয়। দুঃখ আরম্ভ হয়। ইহাই লোকচক্রের আরম্ভ।

অজ্ঞানতা থেকে আমাদের মধ্যে যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয় তাই গভীর আসক্তিতে পরবর্তিত হয়ে দূষিত ভব-চক্রের রূপে বাড়তে থাকে এবং আমাদের ব্যাকুল, ব্যথিত করে এবং আমাদের দুঃখের সংসার বাড়াতে থাকে। এই ভবচক্রকে ধ্বংস করার জন্য আমাদের ভেতরে ধর্মচক্র জাগ্রত থাকা নিতান্তই আবশ্যক। যদি ধর্মচক্র জাগ্রত হয়, তাহলে বিবেক, বিদ্যা এবং জ্ঞান জাগে। যেমন কোন ইন্দ্রিয় এবং ইহার বিষয়ের পরস্পর সংস্পর্শের ফলে চিত্তে কোন সংবেদনা উৎপন্ন হয়, প্রিয়ই হোক বা অপ্রিয় হোক, সুখদ হোক বা দুঃখদ হোক—তদ্রুপ পাগলের মতো ঐ বিষয়ের প্রতি রাগ-রঞ্জিত এবং দ্বেষ-দূষিত না হয়ে ইহার নশ্বর-নিঃসার স্বভাবকে জেনে প্রজ্ঞা এবং অনাসক্তিভাব জাগ্রত করা উচিত। এর দ্বারাই লোকচক্রের প্রবর্তন রুদ্ধ হয়। ইহার বিস্তারলাভ হয় না। ইহাই ধর্মচক্র-প্রবর্তন। ধর্মচক্র প্রবর্তনের এটাই প্রত্যক্ষ লাভ। বিদর্শন সাধনার নিরন্তর অভ্যাসের দ্বারা নিজের অন্তর্মনে অনুভূত প্রত্যেক সংবেদনাকে জানুন এবং জেনে তাতে জড়িত হবেন না। তটস্থ হয়ে থাকুন। ধর্মচক্র প্রবর্তিত রাখুন।

ধর্মচক্র প্রবর্তিত রাখলে আমাদের মঙ্গল এবং কল্যাণই হবে।

১৬· সম্যক্ ধর্ম

'সম্যক্' মানে হচ্ছে ঠিক, যথার্থ, সত্য। অতএব সম্যক্ ধর্ম মানে সত্যধর্ম, সৎ ধর্ম, সদ্ধর্ম—যে ধর্মে মিথ্যার কোন স্থান নেই, কল্পনার সঙ্গে যার কোন সম্পর্ক নেই। যদি কোন উপদেশক কোন মিথ্যা কথাকে, শুধু মিথ্যা কেন কোন সত্য কথাকেও অন্ধ শ্রদ্ধার দ্বারা কেবল কল্পনার স্তরে স্বীকার করার আগ্রহ প্রকাশ করেন তাহলে মনে করবেন সেটা সম্যক্ নয়, মিথ্যা ধর্মের উপদেশই তিনি করছেন।

সম্যক্ অর্থ শুদ্ধ, স্বচ্ছ, নির্মল, নির্দোষ, নিষ্কলুষ। অতএব সম্যক্ ধর্মের অর্থ শুদ্ধ ধর্ম যেখানে পাপের কোনও স্থান নেই। যার সঙ্গে জোর-জবরদস্তীর কোন সম্পর্ক নেই। ধর্ম নির্মল হলে সহজ স্বীকার্য হয়, কারণ সেটা ন্যায়সঙ্গত হয়, যুক্তিসঙ্গত হয়। যদি কোন উপদেশক বলেন—আমার কথা নির্বিচারে, বিনা তর্ক-বিতর্কে, অন্ধভাবে চোখ বুজে এইজন্যই মেনে নাও, কেননা না মানলে কোন অদৃশ্য সত্তা তোমাদের অসহ্য নারকীয় যন্ত্রণায় দণ্ড দেবে, আর মানলে প্রসন্ন হয়ে তোমাদের সমস্ত পাপ থেকে (তোমাদের) অব্যাহতি দেবে এবং স্বর্গীয় সুখের আশীর্বাদ দেবে—তাহলে মনে করবেন সেটা সম্যক্ নয়, মিথ্যা ধর্মেরই ছলনা।

সম্যক্ অর্থ অক্ষত, অখণ্ড, অবিকল, পূর্ণ। অতএব সম্যক্ ধর্মের অর্থ পরিপূর্ণ পরিপক্ক ধর্ম। ধর্মের পরিপূর্ণতা, পরিপক্কতাকে সম্পূর্ণরূপে ধারণ করার মধ্যেই নিহিত। কেবল পঠন-পাঠন, চর্চা-পরিচর্চা ধর্মের অবিকল্প পরিপূর্ণতা নহে। বুদ্ধি-বিলাস এবং বুদ্ধিরঞ্জন ধর্মের পূর্ণ পরিপক্কতা নয়। পড়ে এবং শুনে ধর্মের চিন্তন-মনন করে তাকে সম্যক্‌ভাবে ধারণ করে লওয়া, জীবনের সঙ্গী করে নেওয়া, সহজ স্বভাব করে নেওয়াই ধর্মের পরিপূর্ণতা ও পরিপক্কতা। এটাই ধর্মের সম্যক্‌ত্ব। যদি কোন উপদেশক বলেন—আমার কথা শোনা মাত্রই অথবা অমুক ধর্মগ্রন্থ পাঠ করা মাত্রই অথবা অমুক দার্শনিক সিদ্ধান্তকে স্বীকার করে নেওয়া মাত্রই তোমাদের মুক্তি হয়ে যাবে, ধর্ম ধারণ না করলেও কোন অদৃশ্য সত্তা এতেই তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তোমাদের সমস্ত পাপ ধুয়ে দেবে—তাহলে মনে করবেন সেটা সম্যক্ নয়, মিথ্যা মায়াবী।

সত্য এবং স্বচ্ছ ধর্মজীবনে প্রবেশ করতে হবে—তাহলেই সম্যক্ এবং কল্যাণপ্রদ হবে। অন্যথা ভ্রান্ত এবং দুঃখদায়ী। যে কোন ব্যক্তির ধর্মের স্বরূপ সামান্যও উপলব্ধ হয়েছে তিনি সর্বদাই এই ভ্রান্তি থেকে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করেন। তিনি ধর্মকে চিরাচরিত প্রথা পালন এবং বুদ্ধি-বিলাসের বিষয় হতে দেন না। তাঁর সমগ্র শক্তি ধর্মকে ধারণ করার অভ্যাসেই নিয়োজিত করেন। এ বিষয়ে আমাদের দেশেরই এক প্রসিদ্ধ ঘটনা আছে। কুরু প্রদেশের এক বালক রাজকুমার যুধিষ্ঠির। অন্য রাজকুমারদের সঙ্গে তিনিও গুরুর কাছ থেকে দুটো ছোট ছোট বাক্যে ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ লাভ করেছেন। অন্যান্যরা ঐ

বাক্য দুটোকে আবৃত্তি করে করে গুরু মহারাজের সাধুবাদ সহজেই হাসিল করে নিল। কিন্তু বালক যুধিষ্ঠিরের কাছে সম্যক্ ধর্মই ছিল যথার্থ ধর্ম। তিনি সেই ধর্মকে ধারণ করার অভ্যাসে দিন কাটাতে লাগলেন এবং এর কারণ না বুঝে স্বয়ং গুরুই তাঁর প্রতি রুষ্ট হয়ে গেলেন। সম্যক্মার্গী সুবোধ রাজকুমারের শাস্তি হ'ল। যেহেতু দোষী ছিলেন দুর্বোধ আচার্য। বেচারা আচার্যই বা কি করবেন? তিনিও চিরাচরিত সংস্কার এবং পরম্পরার শিকার ছিলেন। খোলসকেই তাঁর ধর্ম বলে মানার আদত ছিল। তাঁর কাছে তো ধর্মের খোলসই অধিক মূল্যবান ছিল। —এই রাজকুমারদের ধর্মের কিছু বুলি শিখিয়ে দেব। তারা মুখস্ত করে করে মনে রাখবে। বাড়ী ফিরলে মা-বাবা জিজ্ঞেস করবেন—পাঠশালাতে আজ কি কি পড়েছো? বিদ্যার্থীরাও মুখস্ত করা সেই ধর্ম-বুলি তোতা পাখীর মতো শুনিয়ে দেবে। মা-বাবাও খুশীতে ডগমগ হয়ে যাবেন। আচার্যেরও শ্রম সফল হবে। তিনি পুরস্কৃত হবেন। তাঁর জীবিকাও সচ্ছলভাবে চলতে থাকবে। —গুরুজীব দৃষ্টিতে ধর্মের পঠন-পাঠনের এটুকুই মূল্য ছিল। ধর্মের এই নিকৃষ্ট এবং লঘু মূল্যাংকন না জানি কবে থেকে দেশে চলে আসছে! আজও তা বর্তমান আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। পড়া, শোনা বা মনে করার কাজ সরল। কিন্তু জীবনে সেগুলোকে প্রয়োগ করার কাজ কঠিন। অত্যন্ত কঠিন। কঠিন বলেই কেউ তা করতে চায় না। এই জন্যই আমরা ধর্মের নামে অধিকতর মিথ্যাধর্মেরই শিকার হয়ে থাকি। সম্যক্ ধর্ম আমাদের থেকে অনেক অনেক দূরে থেকে যায়। কাছে আসবেই বা কি করে? যখন মিথ্যাকেই সম্যক্ বলে মেনে বসে থাকি, তাহলে মিথ্যাই হয় প্রমুখ এবং সম্যক্ গৌণ হয়ে যায়। অতএব সম্যক্কে কাছে নিয়ে আসার কোন চেষ্টাও আমরা করি না।

কায়, বাক্ এবং চিত্তের সকল কর্মেই ধর্মকে লাগাতে পারলেই তা সম্যক্। যদি একেই জীবনের চরম লক্ষ্য মনে করে অভ্যাস করতে পারা যায়, তাহলে যতটা সাফল্য লাভ করা যায়, ততটাই লাভ। পূর্ণ সাফল্য পেলে নিঃসন্দেহে পূর্ণ লাভ। সর্বাঙ্গীণ সম্যক্ ধর্মকে জীবনে প্রয়োগ করার অভ্যাস করাতেই আমাদের যথার্থ মঙ্গল নিহিত রয়েছে। জাতি ধর্ম সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলেরই যথার্থ মঙ্গল এতে নিহিত আছে। দেখুন, ধর্মের সর্বাঙ্গীণ সম্যক্ স্বরূপ কি?

আমাদের বাক্য সম্যক্ হবে। বাক্য সম্যক্ তখনই হয় যখন আমরা মিথ্যাকপটতা, গালি-গালাজ, কটু-কঠোর, চুক্লি-নিন্দা এবং মিথ্যা প্রলাপ পূর্ণ কথা-বার্তা বলা থেকে বিরত থাকি।

আমাদের শারীরিক কর্ম সম্যক্ হবে। শারীরিক কর্ম তখনই সম্যক্ হয় যখন আমরা হিংসা-হত্যা, চুরি-জুচ্চোরী, নেশাদি দুষ্কর্ম থেকে যথার্থই বিরত থাকি।

আমাদের শারীরিক কর্ম সম্যক্ হবে। শারীরিক কর্ম তখনই সম্যক্ হয় যখন আমরা হিংসা-হত্যা, চুরি-জুচ্চোরী, নেশাদি দুষ্কর্ম থেকে যথার্থই বিরত থাকি।

আমাদের জীবিকা সম্যক্ হবে। জীবিকা তখনই সম্যক্ হয় যখন আমরা

নিজেদের জীবনযাপনের প্রণালীগুলোকে বাস্তবিকতার স্তরে বিশুদ্ধ করার নিমিত্ত ছল, ছদ্ম, জালিয়াতি, চুরি, ডাকাতিকে সর্বদা ত্যাগ করতে পারি এবং এমন কোন ব্যবসা না করি যার দ্বারা ধন সঞ্চয়ের তীব্র লালসার বশীভূত হয়ে অন্য অনেকের ক্ষতিসাধন করতে হয়।

আমাদের প্রচেষ্টা সম্যক্ হবে। প্রচেষ্টা তখনই সম্যক্ হয় যখন প্রত্যেক প্রচেষ্টা বাস্তবিক এমন এক রূপ পরিগ্রহ করে যার দ্বারা আমাদের মন দুর্গুণ থেকে মুক্ত এবং সদ্‌গুণসম্পন্ন হয়।

আমাদের জাগরুকতা বা স্মৃতি সম্যক্ হবে। জাগরুকতা বা স্মৃতি তখনই সম্যক্ হয় যখন আমরা নিজেদের কায়িক, বাচিক এবং মানসিক কর্মসমূহের প্রতি সজাগ, সচেতন থাকার প্রকৃত অভ্যাসে নিরত থাকি।

আমাদের সমাধি সম্যক্ হবে। সমাধি তখনই সম্যক্ হয় যখন সর্বদা অভ্যাসের দ্বারা আমরা নিজেদের চিত্তকে সত্য-অবলম্বনের আশ্রয়ে বেশীক্ষণ সজাগ, সচেতন এবং সমাহিত রাখতে পারার প্রকৃত সাফল্য লাভ করি।

আমাদের সংকল্প সম্যক্ হবে। সংকল্প তখনই সম্যক্ হয় যখন আমরা নিজেদের চিত্তপ্রবাহ থেকে হিংসা, ক্রোধ, দ্বেষ, দৌর্মনস্যের দুর্বৃত্তিসমূহকে দূর করতে সক্ষম হই।

আমাদের দর্শন সম্যক্ হবে। দর্শন তখনই সম্যক্ হয়, যখন আমরা মিথ্যা-কুসংস্কার থেকে মুক্তি পেয়ে পরম সত্যকে যথার্থতঃ দর্শন করতে পারি।

দর্শন শব্দের অর্থ **'ফিলসফী'** নয়। অন্যথা কোন মত-মতান্তরের **ফিলসফী**-র সিদ্ধান্তের মননই আমাদের কাছে সম্যক্ দর্শন হয়ে বসবে এবং এই প্রকার মিথ্যা দর্শনে আমরা জড়িয়ে থাকবো। দর্শন মানে সাক্ষাৎকার। কিন্তু সাক্ষাৎকারের অর্থও এটা নয় যে বারবার স্মরণের দ্বারা যথার্থরূপে সর্বথা দূরবর্তী কোন কল্পনা-প্রসূত রং-রোশনাই বা রূপ-আকৃতিকে চোখ বন্ধ করে দেখে সেই মিথ্যা দর্শনকে সম্যক্ দর্শন বলে মনে করা। দর্শন মানে হচ্ছে সত্যের স্বানুভূতি। নিজের অভ্যন্তরে স্থূল সত্য থেকে আরম্ভ করে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর সত্যসমূহের স্বানুভবের কালে যখন পরম সত্যের স্বানুভূতি হয়, তা হলেই দর্শন সম্যক্ হয়। সম্যক্ দর্শনের এই অনুভূতির জন্য যথার্থ যে জ্ঞান হয় সেই জ্ঞানই সম্যক্। অন্যথা বুদ্ধি-বিলাসের ফলে মিথ্যা জ্ঞান হয়। সম্যক্ দর্শন এবং সম্যক্ জ্ঞান হচ্ছে একই মুদ্রার দুই দিক। উভয়েরই উপলব্ধি সাথে সাথেই হয়। সম্যক্ দর্শন হয়ে গেলে সম্যক্ জ্ঞান, সম্যক্ বোধ হয়েই যায়—ইহাই অভ্যাসজনিত ধর্মের চরম উৎকর্ষ।

সর্বদা অভ্যাস করে করে সর্বাঙ্গীণ ধর্মকে যখন আমরা সম্যক্ করতে পারি, পরিশুদ্ধ করতে পারি—তাহলে জীবন-ব্যবহারে স্বভাবতঃ সর্বতোমুখী উন্নতি হয়। কায়িক, বাচিক এবং মানসিক কর্মসমূহ থেকে অশুদ্ধি দূর হয়। জীবন কৃতকৃত্য হয়, ধন্য হয়। ত্রিবিধ আচরণ নিজের থেকেই শুদ্ধ হতে শুরু করে। চরিত্র

সম্যক্ হয়। যদি এইরকম না করে কেবল কোন সম্প্রদায়বিশেষের সংস্কার পরম্পরাকে পালন করে নিজেই নিজেকে সম্যক্ সচ্চরিত্র বলে জাহির করি, তাহলে সেটা হবে ধোঁকাবাজী। চিত্ত বিকারমুক্ত হলো না, নিজের ব্যবহারে সৌম্যতা এলো না, পারস্পরিক আচরণে শুদ্ধি এলো না—তবুও নিজেকে সম্যক্ চরিত্র্যবান বললে চরম মিথ্যাকেই সম্যক্ বলে মেনে নেওয়ার ভ্রান্তি হবে না কি?

ধর্মের তিন অঙ্গ—**পরিয়ত্তি, পটিপত্তি** এবং **পটিবেধ**। পরিয়ত্তির অর্থ হচ্ছে ধর্মের শাস্ত্রীয় জ্ঞানের নিপুণতা। পটিপত্তির অর্থ হচ্ছে ধর্মপন্থার স্বয়ং প্রতিপাদন অর্থাৎ বাস্তব জীবনের ব্যবহারে ধর্মকে লাগানো। পটিবেধ হচ্ছে মার্গের অনুশীলনে রত থেকে সমস্ত বাধাবিঘ্নকে দূর করে ধর্মের অন্তিম লক্ষ্যকে লাভ করা। ধর্মের পরিয়ত্তি অঙ্গ নিরর্থক নয়। বরং ইহা সার্থক তখনই হয় যখন ধর্মের বাকী দুটো অঙ্গের—পটিপত্তি ও পটিবেধ—সম্যক্ প্রয়োগ করা যায়।

ধর্ম শাস্ত্রীয় জ্ঞানে নয়, আচরণেই নিহিত। ধর্ম সৈদ্ধান্তিক মান্যতাতে নয়, সিদ্ধান্তসমূহকে জীবনে প্রয়োগ করার মধ্যেই নিহিত। ধর্মকে, আচরণে প্রয়োগ করতে পারলেই ধর্ম পরিপূর্ণ হয়, সম্যক্ হয়। অন্যথা মিথ্যা মিথ্যাই থেকে যায়। বৌদ্ধ বা জৈন, খৃষ্টান বা হিন্দু, মুসলমান বা ইহুদী, পারসী বা শিখ—যিনিই হোন না কেন সকলের ক্ষেত্রেই একথা প্রযোজ্য।

যে কোন সম্প্রদায়ের ধর্মগুরুকে জিজ্ঞেস করে দেখুন তিনি বলবেন—'ধর্ম সম্বন্ধে উপরোক্ত কথাগুলো অর্থাৎ কায়িক, বাচিক এবং মানসিক কর্মসমূহকে শুদ্ধ করার কথা আমাদের ধর্মেরই কথা।' কেউ একথা বলবেন না—'ওগুলো আমাদের ধর্মের বাইরের কথা।' অতএব এই কথাগুলো সকল ধর্মেরই কথা। অতএব সার্বজনীন। সম্প্রদায়-বিশেষের নহে। তবে সঙ্গে সঙ্গে এটাও দেখা যায় যে কল সম্প্রদায়ের এই রকম লোকের সংখ্যাই বেশী যাঁরা নিজেদের ধর্মবান বলে মনে করেন অথচ ধর্মের সার একটুও ধারণ করেন না। ধর্মকে জীবনে ব্যবহার করেন না। অতএব এই ব্যাধিও সার্বজনীন, বিশ্বব্যাপী। কোন এক সম্প্রদায় বিশেষের নহে।

আমরা ধর্মজীবন যাপন করছিনা এটা যতটা খারাপ তার চেয়ে হাজার গুণ বেশী খারাপ হচ্ছে আমরা ধর্মজীবন যাপন না করেও 'করছি' বলে যে ভ্রম। বিচিত্র বিড়ম্বনা! রোগী হয়েও আমরা নিজেদের নীরোগ বলে মনে করি। আজব নেশা এবং ভ্রান্তি আমাদের ছেয়ে আছে। সকল সম্প্রদায়ের লোকেরই একই নেশা এবং ভ্রান্তি। সকলেই কূয়োর মধ্যে ডুবে আছে। যে সম্প্রদায়েরই হই না কেন, আমরা কি করি? নিজ নিজ সম্প্রদায়ের কোন বিশিষ্ট বেশভূষা ধারণ করি, অথবা নিজেদের পরম্পরাগত কোন তথাকথিত কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করি, অথবা নিজের সম্প্রদায়ের শাস্ত্রদ্বারা উদ্‌ঘোষিত কোন দার্শনিক সিদ্ধান্তের মান্যতাকে নিজের মনে কট্টরভাবে ধারণ করি, এবং কেবল এইটুকুতেই আমরা মনে করি যে আমরা ধর্মের জীবন-যাপন করছি। অথচ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ধর্মের

কোন চিহ্নই দেখা যায় না। ধর্মের নামে কি গভীর অমাদের এই নেশা এবং ভ্রান্তি! পশ্চিম দেশীয় জনৈক পণ্ডিত ব্যক্তি বলেছেন—ধর্ম হচ্ছে আফিমের নেশা। যেটা ধর্ম নয় তাকে ধর্ম বলে মনে করে জীবন-যাপন শুধু আফিমের নেশা কেন বরং তার চেয়েও বড় কোন নেশা। আফিমের নেশা তো এক সময়ে কেটে যায়, কিন্তু ধর্মের নামে ঐরূপ মিথ্যা নেশাতে ডুবন্ত ব্যক্তি সারাজীবন বেহুঁস অবস্থাতেই কাটিয়ে ফেলে। নেশা কাটানো তে দূরের কথা, বরং দিনের পর দিন তার ঐ নেশা বেড়েই চলে।

নিজের তথা সকলের যথার্থ মঙ্গলকামী ব্যক্তিকে এই নেশাগ্রস্ত বিপজ্জনক অবস্থা থেকে বাঁচতে হবে এবং এটা ভাল করে বুঝতে হবে যে, ধর্মের চরম পরিণতি, ধর্মের অন্তিম লক্ষ্য, ধর্মের একমাত্র উদ্দেশ্য ধর্মকে জীবনে প্রয়োগের মধ্যেই নিহিত আছে। যে ধর্মকে পড়ে শুনে জানা হয়েছে, চিন্তন-মনন করা হয়েছে অথচ ধারণ করা হয়নি, সেটা সম্যক্ নয়, পরিপূর্ণ নয়, পরিপক্ক নয়—এখনও কাঁচা। যে মাটীর কলসী কাঁচা তাকে ভরসা করে নদী পার হতে যাওয়া বিপজ্জনক নয় কি? ওকে পাকাতে হবে। হাজার কাঠিন্য সত্ত্বেও ধর্মকে ধারণ করাতেই প্রাধান্য দিতে হবে। কোথাও এরকম যেন না হয় যে অভ্যাসের রাস্তায় কোন মাইল-নির্দেশক প্রস্তর-খণ্ড আমাদের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে, কোন মায়া-মরীচিকা আমাদের ভ্রান্ত করছে এবং আমাদের প্রগতি থেমে যাচ্ছে। যে ধর্মকে আমরা ধর্ম বলে মানছি সেটা সম্যক্ বা মিথ্যা এই সত্যকে বার বার পরখ করে দেখতে হবে এবং পরখ করার একমাত্র উপায় হচ্ছে এটা দেখা যে ধর্মকে জীবনে ব্যবহার করা হচ্ছে কিনা। আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারে আসছে কি না। ধর্ম যদি বাস্তব জীবনে ব্যবহৃত না হয়, তাহলে যে বেশভুষাই আমরা ধারণ করিনা কেন, যে ক্রিয়াকাণ্ডই সম্পন্ন করিনা কেন, যে সম্প্রদায়েই দীক্ষিত হই না কেন, যে দার্শনিক মান্যতাকেই স্বীকার করিনা কেন আত্মবাদী বা অনাত্মবাদী, ঈশ্বরবাদী বা অনীশ্বরবাদী, দ্বৈতবাদী বা অদ্বৈতবাদী, আমাদের একথা একবাক্যে স্বীকার করা উচিত যে আমরা আর যাই হই না কেন অন্ততঃ ধর্মপরায়ণ নই, কখনও নই।

জীবনে প্রযুক্ত হলেই ধর্ম ধর্ম, তা না হলে ধোঁকা। আমরা কেবল তর্ক, শ্রদ্ধা, সংস্কার-পালন এবং দার্শনিক মান্যতার স্তরে ধর্মকে স্বীকার করেই থেমে যাবো না, বাস্তবিকতার স্তরে ধর্মকে জীবনে প্রয়োগ করতে হবে—তাহলেই সম্যক্ তাহলেই ধর্ম কল্যাণকারী এবং তাহলেই ধর্ম মঙ্গলময় হবে।

১৭· সত্যই ধর্ম

'সত্য' ছাড়া ধর্মের আর কি ব্যাখ্যা হতে পারে? সত্যই ধর্ম, অসত্য অধর্ম। যেখানে সত্যের অর্থ কেবল বাণীর সত্যতা নয়, বরং 'ধর্ম' শব্দের ন্যায় 'সত্য' শব্দেও ব্যাপক অর্থ আছে—অর্থাৎ স্বভাব, গুণ, নিয়ম, বিধান। প্রকৃতির নিজস্ব গুণ-স্বভাব আছে, নিয়ম-বিধান আছে। ঐ সকল নিয়ম-বিধান এবং ঐ সকল গুণ-স্বভাবধর্মের সত্যে সমগ্র সজীব নির্জীব চরাচর বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড বাঁধা আছে। এই ব্যাপক অর্থে 'সত্য' এবং 'ধর্ম' পর্যায়বাচী শব্দ। প্রকৃতির স্বভাবের সত্য আমরা যতটা বুঝি এবং স্বীকার করি, ধর্মকেও ততটাও স্বীকার করতে হবে। সত্যকে তিন প্রকারে স্বীকার করা যায়। স্বীকারের প্রথম পদক্ষেপ শ্রদ্ধার ভূমিকা দিয়ে সুরু হয়। কোন বুদ্ধ, জ্ঞানী নিজের বোধিজ্ঞান দ্বারা লব্ধ এই সত্যকে প্রকাশ করেছেন। আমাদের মনে ঐ মহাপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা জাগে এবং আমরা তাঁর বাণীকে স্বীকার করি। এটা হ'ল শব্দ-সত্যকে স্বীকার করা। কিন্তু শব্দ-সত্যে সত্যের পরিপূর্ণতা হয় না। যখন কোন অনুভূতিজনিত জ্ঞানকে শব্দে ব্যক্ত করা যায়, অর্থাৎ যখন কোন সত্যদ্রষ্টা ঋতদ্রষ্টা ঋষি তাঁর উপলব্ধ সত্যকে শব্দে প্রয়োগ করেন, তাহলে সত্যের কিছু অংশ নষ্ট হয়ে যায়। এইজন্য শব্দ-সত্য হচ্ছে আংশিক সত্য। কারণ শব্দ এবং ভাষার নিজস্ব সীমা আছে। বিশ্বের যে কোন উন্নত থেকে উন্নততর ভাষাও আন্তরিক অনুভূতিসমূহকে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করতে অসমর্থ এবং সত্যসন্ধানীর এমন কিছু অনুভূতি থাকে যেগুলো বর্ণনাতীত। শব্দের দ্বারা ওগুলোর বর্ণনা করা যায় না। ওগুলো সম্বন্ধে 'নেতি-নেতি'ও বলা হয়ে থাকে। বক্তা কেবল এটুকু বলেই থেমে যান যে, "এরকম তো নয়! ওরকম তো নয়!" যে ব্যক্তি কোন একটা জিনিষ জীবনে দেখেনি তাকে সে জিনিষটি সম্বন্ধে শব্দ দিয়ে যথার্থভাবে বোঝানো সম্ভব কি? তদ্রুপ ইন্দ্রিয়াতীত অবস্থার অনুভূতিকে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে কিরূপে বোঝানো সম্ভব? বোঝাবার চেষ্টা করলেও বুঝবে কি করে? অতএব প্রত্যেক সমঝদার (বোদ্ধা)ব্যক্তির এই সকল অনুভবের চর্চা করাকালে 'ন-কার' (নেতি-নেতি) প্রয়োগ করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। পরমার্থ সত্য কখনো শব্দ-সত্য হতে পারে না।

ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতির জন্য তো শব্দ বা বচন অসমর্থই এমনকি ঐন্দ্রিয় অনুভূতীগুলোকেও শব্দ বা বচনে যথার্থভাবে প্রকাশ করা যায় না। সূক্ষ্মতর আন্তরিক অনুভূতিগুলো অনেকটা মূক-ব্যক্তির গুড়ের স্বাদ ব্যক্ত করার মতো। ব্যক্ত করার সকল প্রচেষ্টা অসম্পূর্ণই থেকে যায় না কি? ভাষার সীমার বাইরে বক্তা বা লেখকের এবং তার চেয়েও অধিক শ্রোতা বা পাঠকের নিজ নিজ সীমা আছে যা শব্দ-সত্যের পূর্ণ সত্য হওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করে। বক্তা যা বলতে চায় তাকে ঠিক ঠিক বলতে পারলো না এবং যা বলে তা যে অর্থে বলা হয়েছে শ্রোতা সে অর্থে বুঝলো না—এটাই শব্দ-সত্য বা বচন-সত্যের অপূর্ণতা।

কিন্তু, তা হলেও অনুভূতিজনিত সত্যকে বাক্যে প্রকাশের চেষ্টা হয়েই থাকে।

কোন কোন অংশে বক্তার লাভ হয় কোন কোন অংশে ক্ষতি। যেখানে সেগুলোকে খোলা মনে নিজের করে নেওয়া হয়েছে, সেখানেই লাভ। কিন্তু যেখানে সেগুলোকে পূর্ণ সত্য বলে মেনে নিতে দ্বিধা হয়েছে—সেখানে সাম্প্রদায়িক অন্ধবিশ্বাস এবং অন্ধমান্যতাসমূহ প্রাধান্য লাভ করে। তখন বুঝতে হবে যেন লোকের বুদ্ধিতে তালা পড়েছে অর্থাৎ মানুষের বিচার বিবেচনা করার ক্ষমতা চলে গেছে। সত্য অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে মানবের প্রগতি রুদ্ধ হয়েছে।

অথচ আসলে মানুষ তো মনুরই ছেলে, তাই না? অর্থাৎ মন থেকে জাত। মনন-চিন্তন করেই কোন সত্যকে স্বীকার করা তার সহজাত ধর্ম। সাম্প্রদায়িক নেতারা মানুষের চিন্তন-মননের প্রতিভাকে কুণ্ঠিত করে তাকে জড়ভরত বানিয়ে রাখার হাজার প্রচেষ্টা চলায়। তৎসত্ত্বেও মানব সমাজের একটা প্রবুদ্ধ শ্রেণী শব্দ-সত্যকে পরীক্ষা করার, বুদ্ধি পাল্লায় পরিমাপ করার এবং যুক্তিতর্কের কষ্টিপাথরে যাচাই করার কাজে নিরত থাকে। এর দ্বারা সত্যের অন্য এক স্বরূপ জাগ্রত হয়, যাকে বলা হয় অনুমান সত্য বা বৌদ্ধিক সত্য। সকল সত্যকে বুদ্ধির ভাটিতে উত্তপ্ত করতে হবে। তাকে পরীক্ষার কাজে বুদ্ধি লাগাতে হবে। যুক্তিযুক্ত এবং তর্কসঙ্গত মনে হলেই গ্রহণ করা উচিত। এই নীতিবোধের ফলেই সত্যের অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে মানবের প্রগতি আরম্ভ হয়েছে। সকল অন্ধবিশ্বাস অন্ধমান্যতা এবং সাম্প্রদায়িক হীনতার পায়ে কুঠারাঘাত হয়েছে। মানবীয় বিকাশের রাস্তা খুলেছে। অন্ধ শ্রদ্ধা এবং ভক্তিভাবাবেশের শ্বাসরোধী মহল থেকে এবং বচন-সত্যকে সম্পূর্ণ সত্য বলে মেনে নেওয়ার দুরাগ্রহপূর্ণ ঘন কুয়াসা থেকে বাইরে বের হয়ে আসার সাফল্য লাভ হয়েছে। কোন কথাকেই চোখ বন্ধ করে মেনে নেওয়ার আদত চলে গেছে। 'কেন এ রকম?'—এটা জানার উৎসুক্য বেড়েছে।

কিন্তু যে প্রকারে বচন-সত্যের মান্যতা অধিকতরভাবে অন্ধবিশ্বাস দ্বারা দূষিত হয়ে উঠেছে, তদ্রুপ অনুমান বা বৌদ্ধিক সত্যের মান্যতাও নানাপ্রকার শুষ্ক তর্ক-বিতর্কের ঘন জঙ্গলে বিমূঢ় হয়ে গেছে। শব্দ এবং অনুমানের দ্বারা সত্যের আভাসমাত্রই হতে পারে, অনুভূতি নহে। সত্যাভাস অর্থাৎ ধর্মাভাস। আর যেখানে ধর্মাভাস হয় সেখানে ধর্মের নামে ভ্রান্তির উৎপাদন হওয়ারই আশঙ্কা থাকে। সত্যের অনুভূতিই ধর্মের যথার্থ অনুভূতি। অতএব, এই দুইয়ের অগ্রবর্তী কল্যাণকারী লক্ষ্য প্রত্যক্ষ সত্যেরই লক্ষ্য। প্রত্যক্ষ সত্য অর্থাৎ স্বানুভূতির স্তরে প্রকট হওয়া সত্য। আধ্যাত্মিক সত্যের সূক্ষ্ম অভ্যন্তরীণ অনুসন্ধানের ইহাই যথার্থ যাত্রা। ইহাই ধর্মের গভীর অনুসন্ধান। এই সকল প্রত্যক্ষ অনুভূতির দ্বারা যতটা সত্যাংশ প্রকটিত হয়, মানব ধর্মপথে ততটাই এগিয়েছে বলতে পারা যায়।

কিন্তু অনুভূতির স্তরে সত্যধর্মকে স্বয়ং অন্বেষণ করে—তাকে স্বীকার করা কঠিন কাজ। বরং অন্ধবিশ্বাসের স্তরে কোন পর-কথনকে স্বীকার করে নেয়া সহজ। এইজন্য মানব জাতির সুদীর্ঘ ইতিহাসে শব্দ-সত্যের আধারে অন্ধবিশ্বাসী

সম্প্রদায়ই অধিকতর উন্নত হয়েছে। খুব সামান্য লোকই অন্ধবিশ্বাসকে ভেঙে দিয়ে বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োগ করতে পেরেছেন। কিন্তু তাঁরাও বহুধা অনুভূতির ক্ষেত্রে রিক্ত থাকার দরুন বৌদ্ধিক মত-মতান্তরযুক্ত সম্প্রদায়সমূহের প্রণেতা অথবা অনুগামীই হয়ে থেকে গেছেন; যেখানে আন্তরিক অনুভূতি হয় সেখানে সাম্প্রদায়িক ভেদ-ভাবের প্রবণতা কম থাকে। অন্যথা শব্দ এবং বৌদ্ধিক তর্ক-বিতর্কের ভিন্নতা বিভিন্ন সম্প্রদায়কে পোষণ করে। আন্তরিক অনুভূতিগুলোও নিরপেক্ষ সত্য এবং শুদ্ধির কারণ হলেই শুদ্ধ ধর্ম বলবান হয়, অন্যথা পূর্বাগ্রহ পূর্ণ হলে এগুলো মত-মতান্তর সমূহেরই প্ররোচনা দেবে।

বস্তুত সত্য একটাই। ভিন্ন ভিন্ন কেমন করে হবে? সমগ্র প্রকৃতির বিধান এক-ই, আলাদা-আলাদা কিভাবে হবে? কিন্তু কারও প্রত্যক্ষ অনুভূতিতে আগত এই বিধান যখন 'বাণী'র বেশভূষা ধারণ করে তখন এই বেশভূষা ভিন্ন ভিন্ন হয়। ভাষা, শব্দ, বক্তা ভিন্ন ভিন্ন হওয়াতে সত্যও ভিন্ন ভিন্ন বলে মনে হতে থাকে। যখন কোন ভক্ত কোন মহাপুরুষের দ্বারা অনুভূত সত্যকে স্বয়ং নিজের অনুভূতিতে উপলব্ধি করার চেষ্টা না করে অন্ধশ্রদ্ধাজনিত ভাবাবেশের স্তরে তাঁর বাণীকেই স্বীকৃতি দিয়ে নিজেকে ধন্য মনে করে—তাহলে সেই বাণী এবং শব্দসমষ্টির সঙ্গেই সেই ব্যক্তির গভীর বন্ধন হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। তাঁর কাছে ঐ শব্দ এবং বাণীই সত্য, বাকী সব মিথ্যা। এর থেকেই সম্প্রদায়ের বুনিয়াদ গড়তে সুরু করে। সত্যের সাক্ষাৎকার যিনি করেছেন তাঁর সঙ্গে সম্প্রদায়ের কিই বা সম্বন্ধ? কিন্তু শব্দ এবং বাণীর চক্রে যারা বাধা পড়েছে তারাই সম্প্রদায়কে পোষণ করে। প্রথম শ্রেণীর জন্য ভাষা একমাত্র মাধ্যম, অতএব সেটা গৌণ। কিন্তু দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে ভাষা এবং শব্দই প্রমুখ।

যদি আমি হিন্দু-সম্প্রদায়ের হই তা হলে 'যম-নিয়ম' শব্দের প্রয়োগ দেখে প্রসন্ন হই। বৌদ্ধ হলে 'পঞ্চশীল', জৈন হলে 'অনুব্রত' এবং খৃষ্টান হলে 'টেন কমাণ্ডমেন্ট্স' শব্দ শুনে গর্বে বুকের ছাতি স্ফীত হয়। কিন্তু ধর্মের বাস্তবিক সত্য জীবনে প্রযুক্ত হোক বা না হোক, শীল-সদাচার জীবনের অঙ্গ হোক বা না হোক—নিজেদের সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক বৃত্তির ফলে আমরা কেবল কতকগুলো শব্দকেই 'আমার ধর্ম' 'তোমার ধর্ম' বলে ভাল-মন্দের সংজ্ঞা দিয়ে থাকি।

"সম্যক্ জ্ঞান, সম্যক্ দর্শন, সম্যক্ চারিত্র্য"—এই শব্দগুলোর প্রয়োগ যে কোন জৈনের কাছে শ্রুতিমধুর, এইভাবে "শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা" শব্দগুলো যে কোন বৌদ্ধের কাছে 'স্থিতপ্রজ্ঞ, অনাসক্ত' শব্দগুলো যে কোন গীতা-ভক্তের কাছে এবং 'হোলী, ইন্ডিফারেন্স' শব্দগুলো যে কোন খৃষ্টানের কাছে অত্যন্ত প্রিয়। তদ্রুপই 'ধর্ম' শব্দ শুনলে কারও মনে হয় কানে যেন রূপোর ঘন্টা বাজছে। আবার ঐ ব্যক্তিরই 'ধম্ম' শব্দ শুনলে মনে হয় বুকের উপর কে যেন ধমাধম মুষলের আঘাত করছে। ঠিক এর বিপরীত হচ্ছে—'ধম্ম' শব্দ শুনলে কারও কাছে মনে হয় যেন দেব-দুন্দুভি বাজছে, শ্রুতিমধুর মঙ্গলধ্বনি যেন

হচ্ছে। আবার তাঁরই কাছে 'ধর্ম' শব্দ যেন কাঁটা দিয়ে বিদ্ধ করে। দেখুন, শব্দের সঙ্গে আমরা কেমন আসক্তি উৎপন্ন করে ফেলেছি। এই কারণে এদের অর্থের প্রতি ধ্যান যায় না, এবং ধ্যান গেলেও সেটা নিরর্থক হবে, যদি সেই অর্থকে জীবনে প্রয়োগ করা না যায়। সম্প্রদায় এবং ধর্মের মধ্যে ইহাই মৌলিক পার্থক্য। সম্প্রদায় কতকগুলো শব্দকেই মাহাত্ম্য দেয়, আর ধর্ম সেগুলোর অর্থকে এবং সেই অর্থকে ধারণ করাকেই মাহাত্ম্য দেয়। আমরা নিজেদেরকে যতই সম্প্রদায়-বিহীন বলি না কেন, কিন্তু এটাই সত্য যে আমাদের কাছে সম্প্রদায়ই প্রমুখ হয়ে গেছে। এইজন্য আমাদের কাছে শব্দই প্রমুখ হয়ে গেছে, অর্থ গৌণ। প্রত্যক্ষ অনুভূতি তো লুপ্তপ্রায় হয়ে গেছে। যাকেই দেখুন না কেন, দেখবেন যে সে শব্দ-সত্যের পেছনেই পাগল। খুব অল্প লোকই যাঁরা অনুমান সত্যের দিকে ঝুঁকেছেন। প্রত্যক্ষ সত্য পর্যন্ত যাওয়ার কারও ফুরসতই নেই এবং কেউ তার আবশ্যকতাও মনে করেন না।

আমরা যারা হিন্দু আমাদের চিত্ত রুষ্ট হয় যখন দেখি যে কোন অ-হিন্দু গীতার কোন শ্লোক নিজের ভাষণে উদ্ধৃত করছেন। তদ্রুপ আমরা যারা বৌদ্ধ বা জৈন, আমাদের ত বুকে বাজতে থাকে যখন দেখি যে কোন অবৌদ্ধ বা অজৈন ধম্মপদ বা মহাবীরের বাণী নিজের ভাষণে উদ্ধৃত করছেন! দেখুন, নিজ নিজ সম্প্রদায়ের বাণীর প্রতি আমরা কিরূপ আসক্ত হয়ে পড়েছি। যেই পরম্পরা এবং পরিবেশে আমরা জন্মেছি ও পালিত হয়েছি তার ধর্মগ্রন্থের প্রতি শ্রদ্ধা, আদর এবং অনুরাগ হওয়াতে কোন দোষ নেই, কারণ তার থেকে আমরা প্রেরণা এবং মার্গদর্শন পেয়ে থাকি । কিন্তু দোষ হচ্ছে আসক্তিতে, এবং লেগে থাকাতে। আমাদের এই লেগে থাকারই পরিণাম হচ্ছে এই যে, যদি ঐ সত্যকে কোন অন্য সম্প্রদায়ের লোক নিজের ভাষায় বলে এবং নিজেদের মহাপুরুষ দ্বারা কথিত কোন কথাকে ব্যক্ত করে, আমাদের মন কি রকম খারাপ হয়ে যায়। নিজেদের সত্যকেও তখন পরপর মনে হয়। এই আসক্তির মুখ্য কারণ হচ্ছে আমাদের শ্রদ্ধা বন্ধ্যা হয়ে গেছে। তার কোন ফল হয়নি। আমরা নিজেদের ধর্মগ্রন্থের সত্যকে কেবল শ্রদ্ধা পর্যন্তই সীমিত রেখেছি। নিজ অনুভূতির দ্বারা তার স্বাদ চেখে দেখিনি। অতএব আমাদের জন্য তো সর্বদা শব্দই সত্য রয়ে গেছে। আর যে শব্দসমূহে এই সত্য ব্যক্ত হয়েছে তা আমাদের পরম্পরার নয়, এইজন্য আমাদের জন্য শব্দসমূহের সাথে সাথে সত্যও পর হয়ে গেছে। কিন্তু যখন আমরা ঐ সত্যকে স্বয়ং সাক্ষাৎকার করতে পারি তাহলে তাতে আর 'পরত্ব' থাকে না। সত্য তো সত্যই, সত্য আবার আলাদা আলাদা কেমন করে হয়? সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, হিব্রু আরবী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষার শব্দ শব্দ-সত্য স্বীকারকারীর কাছে আলাদা আলাদা লাগবে। কিন্তু এর থেকে একটু আগে বাড়ুন এবং একটু বুদ্ধিপ্রয়োগ করুন, তাহলে এই বৌদ্ধিক অনুমান-সত্য কোন জটিলতাকে বিজটিত করতে সহায়ক হবে। সত্যের সহিত সম্বন্ধরক্ষাকারী

অনেক বিভিন্নতাকে দূর করবে। কিন্তু যখন স্বয়ং অনুভূতিতে অবতরণ করতে সুরু করবে, তাহলে সত্যের সমস্ত বিভিন্নতা আস্তে আস্তে দূর হবেই। সত্যবিষয়ে ভেদদৃষ্টি আসবে না।

সত্য নিজেরও নয়, অন্যেরও নয়। পুরাণোও নয় নতুনও নয়। বৃদ্ধও নয়, যুবকও নয়। বর্মীও নয়, ভারতীয়ও নয়। হিন্দুও নয়, মুসলমানও নয়। সত্য সত্যই—সর্বদা একরকম, সর্বত্র একরকম। কিন্তু কোন মান্যতাকে যখন মিথ্যা কল্পনার উপর আশ্রিত করে সত্য বলে মানতে সুরু করি, তাহলে বিভিন্নতা আসবেই। নিরপেক্ষ অনুভূতিজনিত সত্যে কোন ভেদ থাকে না। শব্দসত্য এবং অনুমান সত্যের সীমাকে লঙ্ঘন করে' যখন আমরা প্রত্যক্ষ সত্যকে গুরুত্ব দিতে সুরু করি, তখন মিথ্যা কল্পনার শিকড়গুলি আলগা হতে সুরু করে। শুদ্ধ ধর্ম প্রতিষ্ঠাপিত হতে সুরু করে।অনুভূতির স্তরে যাকে লাভ করা যায় তাই সত্য—এটা মেনে নিয়ে চলাই ধর্মপথে চলা। সত্য, জ্ঞান এবং মুক্তির পথে চলা। এরূপ অবস্থায় অন্ধবিশ্বাস টিকতে পারে না। অসত্য এবং মিথ্যা বেশী এগোতে পারে না। সত্য ধর্ম অনুসন্ধানেরই বিষয়, অন্ধ অনুকরণের নয়।

কিন্তু যেখানে সম্প্রদায়বিশেষ সমৃদ্ধ হয় সেখানে সাম্প্রদায়িক নেতা সত্যকে কাছে ঘেঁষতে দেয় না। সত্যকে তর্কের কষ্টিপাথরে যাচাই করতেও দেয়না। তাকে অনুভূতির স্তরে নিয়ে আসা তো দূরের কথা। বলা হয় যে ধর্মে বুদ্ধিবিচারের কোন স্থান নেই। এটা আবার কিরকম ধর্ম যেখানে বুদ্ধিবিচারের স্থান নেই? বিনা বুদ্ধি-বিচার, বিনা বোধির ধর্ম, ধর্ম কেমন করে হয়? হাঁ, এটা ঠিক যে সম্প্রদায়ে বুদ্ধি-বিচারের স্থান নেই, কেননা বুদ্ধি-বিচার এলেই সম্প্রদায় টুকড়ো টুকড়ো হয়ে যায়। সেখানে তো অন্ধবিশ্বাসই প্রাধান্য লাভ করে, মিথ্যার ধরাতলে অধর্মই তো শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে। ধর্ম শ্রীবৃদ্ধি লাভ করতে পারে না। যখন মানুষ নিজের বুদ্ধিবৃত্তিকে অবরুদ্ধ করে ফেলে তখন সত্যের অনুসন্ধান আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যায়। ধর্মের পা কেটে যায়, ধর্মের চোখ অন্ধ হয়ে যায়, ধর্ম খোঁড়া এবং অন্ধ হয়ে সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। মানুষ তখনই ধর্মকে শুদ্ধ করা ছেড়েছে যখন "বাবা বচন-প্রমাণ"-ধারী গুরু তার সামনে দরজা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে গেছে।

যে কোনও সংকীর্ণবুদ্ধিসম্পন্ন সাম্প্রয়িক নেতার এই ভয় সব সময় থাকে—"আমার খোঁয়াড়ের একটি ভেড়াও যেন বেড়া ভেঙে অন্য খোঁয়াড়ে না যায়। আমার সকল অনুগামী যেন ভেড়া-ছাগল এবং গাই-বলদের মতো অন্ধ অনুকরণকারী স্বভাবসম্পন্ন হয়ে থাকে।" সেজন্য তিনি তাদের উপর নিজের সাম্প্রদায়িক মান্যতাসমূহের কড়া মদ চাপিয়ে রাখেন। অনেক অদ্ভুত এবং অসঙ্গত কথাকে স্বীকার করে নেওয়ার জন্য বাধ্য করে রাখেন। না মানলে নানা নারকীয় যন্ত্রণার আতংকে ভীত এবং মানলে মুক্তি-মোক্ষের প্রয়োজনে প্রলুব্ধ করে রাখেন। তাঁর দৃষ্টিতে ধর্ম যেন সম্প্রদায়ে পর্যবসিত হয়। ধর্ম চলে যাক, সম্প্রদায় যেন

বেঁচে থাকে। হায়, কী দশা হ'ল এই মনু-পুত্রদের? মনন চিন্তনের স্বভাব হারিয়ে এরা অন্ধসম্প্রদায়ের ভূত নিজেদের ঘাড়ে চাপিয়ে নিয়েছে! আমরা নিজেদের ধর্মগ্রন্থকে না বুঝেও সত্য বলে মানি, আর অন্য সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থকে না পড়েও অসত্য বলে মনে করি—এরূপ ভাবাবেশ আমাদের ভেতরে ছেয়ে গেছে। ধর্মের সঙ্গে আমাদের কোন লেনদেনই নেই। আমাদের কাছে সম্প্রদায়ই প্রমুখ এবং সবকিছু। একেবারে নিকৃষ্ট অধার্মিক দুরাচারী ব্যক্তিও যদি আমাদের সম্প্রদায়ে থাকে দোষ নেই, কিন্তু অতি উত্তম ধার্মিক সদাচারী ব্যক্তি যদি অন্য সম্প্রদায়ের হয়, সে আমাদের চক্ষুশূল।

আমরা মা-বাবা থেকে যেমন আকৃতি চেহারা, বুলি-ভাষা পেয়ে থাকি, তেমনি পেয়ে থাকি অন্ধবিশ্বাস এবং অন্ধ মান্যতা। পেয়ে থাকি অন্ধভক্তির ভাবাবেশ। আরও পেয়ে থাকি সাম্প্রদায়িকতার সেই আতংক এবং প্রলোভন যা আমাদের সকল অন্ধ মান্যতার বন্ধনকে মজবুত বানায়। তবে সঙ্গে সঙ্গে মানবীয় বৌদ্ধিক বৃত্তির বীজও পেয়ে থাকি। আমরা মা-বাবা থেকে পাওয়া আকৃতি-চেহারা বদলাতে পারি না, তবে এই সকল সাম্প্রদায়িক মান্যতাকে নিজের বুদ্ধির প্রয়োগের দ্বারা এবং নিজের অনুভূতির বলে বদলাতে পারি! যতগুলো কাজের সেগুলোকে রাখতে পারি এবং যেগুলো অকাজের সেগুলোর মূল উৎপাটন করতে পারি। বুদ্ধির সামগ্রিক প্রয়োগ না করলে এবং নিজ অনুভূতির একটুও অভ্যাস না করলে, না বুঝেই সেই অন্ধ মান্যতাসমূহকে নিজের আকৃতি-চেহারার ন্যায় যথাযথভাবে রেখে দেবার প্রচেষ্টা অবাধগতিতে চলতে থাকবে।

সত্য ধর্মের অনুসন্ধানে অন্ধ মান্যতার সঙ্গে কোন সমঝোতা হোতে পারে না। যেখানে যেখানে অন্ধ মান্যতার আগ্রহ আছে, সেখানে সেখানে ধর্ম নেই, আছে শুধু সম্প্রদায়। আর বুঝতে হবে যে কেউ স্বার্থবশে বা অজ্ঞানবশে আমাদের নিজের খোঁয়াড়ে বেঁধে রাখতে চায়। সত্য এবং ধর্মের জন্য বিচার, চিন্তা এবং বাণীর স্বাতন্ত্র্য নিতান্ত আবশ্যক। তার চেয়েও বেশী আবশ্যক হচ্ছে প্রত্যক্ষ অনুভূতির অভ্যাস বা চর্চা। অনুভূতিকে শৃঙ্খলিত বা আবদ্ধ করে রাখলে বুঝতে হবে আমরা সত্য এবং ধর্ম থেকে অনেক দূরে সরে গেছি।

অনুমান এবং প্রত্যক্ষ-সত্যের গ্রন্থিবন্ধন বড়ই কল্যাণকারী। যা অনুভব করবে তাকে বৌদ্ধিক স্তরে বুঝতে হবে এবং যাকে বৌদ্ধিক স্তরে বুঝবে, তাকে অনুভূতির স্তরে জানতে হবে—এটাই সত্য-শুদ্ধি। এই সত্য-শুদ্ধিতে শব্দসত্য ভূমিকা এবং মার্গদর্শনের কাজ করে। আমাদের উচিত হচ্ছে খোলা মনে তার উপযোগ করা অর্থাৎ তাকে কাজে লাগানো। কিন্তু যখন সত্যের শোধক কোন পূর্ব মান্যতার পক্ষধর হয়ে যায়, তাহলে সত্যের অনুসন্ধানে ছেদ পড়ে। আবার সারা জীবন ধরে যেন-তেন-প্রকারেণ নিজের মান্যতাকে সত্যাসিদ্ধ করাতেই সব পরিশ্রম লাগাতে হয়।

যে কোন মহাপুরুষের অনুভূতি-সিদ্ধ কথা থাক তাকে আমাদের বুদ্ধির

কষ্টিপাথরে পরখ করে দেখতে হবে। এবং তারই আধারে আমাদের প্রত্যক্ষ অনুভূতির অভ্যাস বা চর্চা হলেই সত্যধর্মেই রথ ঠিকপথে চলছে বুঝতে হবে এবং গন্তব্যস্থলে নির্বিঘ্নে পৌঁছাবেই। সত্যের এই তিন প্রকার গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গকে ঠিক ঠিক ভাবে উপযোগ করতে পারলে আমরা অসত্য থেকে সত্যের দিকে, অজ্ঞান থেকে জ্ঞানের দিকে, বন্ধন থেকে মুক্তির দিকে এগিয়ে যেতে পারবো। এতেই আমাদের সকলের কল্যাণ, মঙ্গল, ভাল নিহিত আছে।

১৮· ধর্ম দর্শন

ধর্ম-দর্শন মানে সত্যদর্শন। যেখানে দর্শনের অর্থ ফিলসফী নয়, তত্ত্ববিবেচনা নয়, বা কোন রূপ-আকৃতিকে দেখা নয়। এখানে দর্শনের অর্থ হচ্ছে প্রত্যক্ষ সত্যের স্বানুভূতি। জীবন-জগতের সত্যকে, প্রকৃতির সর্বব্যাপী বিধানকে প্রত্যক্ষানুভূতির দ্বারা জানাই ধর্মদর্শন, সত্যদর্শন।

দুঃখ থেকে মুক্তি পাবার জন্য ধর্ম আর দর্শন হচ্ছে এর বৈজ্ঞানিক অভ্যাস বা চর্চা। প্রকৃতির যে সকল নিয়ম আমাদের উপর প্রতি মুহূর্তে বর্তাচ্ছে, যেগুলোর সঙ্গে আমাদের সোজাসুজি সম্বন্ধ সেগুলোকে জানা, বোঝা, গ্রহণ করা এবং নিজে নিজেকে সেগুলোর অনুকূল করে তোলা—এটাই ধর্ম দর্শনের উদ্দেশ্য। দর্শনের অভ্যাস দ্বারা এতে আমরা যতটা পক্ক হই ততটাই আমরা ধর্মের প্রতিষ্ঠিত হই,সুখ-শান্তির যথার্থ অধিকারী হই। ধর্মদর্শনের অভ্যাস আধ্যাত্মিক উত্থানের সোপান-পথ।

প্রকৃতির যে সকল নিয়মের সঙ্গে আমাদের দুঃখ এবং দুঃখমুক্তির, বন্ধন এবং বন্ধনমুক্তির সোজাসুজি সম্বন্ধ, সেগুলোকে জানা এবং জেনে সেগুলোকে নিজের ভালর জন্যে উপযোগী করাই ধর্ম। যেটা দুঃখসমূহের কারণ তাকে নিবারিত করা, এবং যেটা দুঃখ বিমুক্তির উপায় তাকে ধারণ করা—এটাই সর্বব্যাপী বিধানের দ্বারা সমন্বয়কারী আত্মহিত বা সর্বহিতকারী ধর্ম। প্রকৃতির কার্য-কারণযুক্ত বিধান সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এই বিধান কারও উপর কোপও করে না, কৃপাও করে না। প্রকৃতির অদৃশ্য শক্তি কাউকে রেহাই দেয় না। যে আইন ভাঙে সে দণ্ডিত হয়, যে আইন পালন করে সে পুরস্কৃত হয়। অগ্নির ধর্ম হচ্ছে জ্বালানো—এটাই প্রকৃতির বিধান। আমরা অজ্ঞানতাবশতঃ যদি অগ্নির দুর্ব্যবহার করি তাহলে এর দ্বারা নিজেরও ক্ষতি এবং অন্যদেরও ক্ষতি হবে। আর সদ্ব্যবহার করলে এর দ্বারা পরিপূর্ণভাবে উপকৃত হই। তদ্রুপ আমাদের দুঃখ অথবা দুঃখনিরোধ আমাদের অজ্ঞানতা এবং জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। নির্গুণ, নিরাকার, ব্যক্তিত্ব-বিহীন, সর্বব্যাপী, অনন্ত বিশ্ববিধান অর্থাৎ বিশ্বধর্মে কারও প্রতি কোন পক্ষপাতের ভাবই নেই। এই বিধান সকলের উপরে সমানবভাবে প্রযুক্ত হয়। যে এতে সমতা লাভ করেছে সে দুঃখমুক্ত হয়েছে। যতটা সমতা লাভ করেছে ততটা দুঃখমুক্ত হয়েছে। যতদিন না আমরা এই সত্যকে ঠিক ঠিক ভাবে বুঝতে পারবো ততদিন আমরা বিপথগামী হয়ে নিজেরই ক্ষতি করবো। আর ঠিক ঠিক বুঝতে পারলে বিপথগমন রুদ্ধ হবে, সংসার-দুঃখ রুদ্ধ হবে। অতএব বিধান অর্থাৎ ধর্ম পালনের প্রয়াসে লেগে পড়ুন এবং অজ্ঞানবশতঃ বিধান-বিরুদ্ধ কর্মের আচরণের ফলে যে কষ্ট পেয়েছেন এবং পাচ্ছেন তা থেকে মুক্ত হোন।

সহন-রহনের সহিত সম্বন্ধরক্ষাকারী শক্তির যে নিয়ম বর্তমান আছে, সেগুলোকে বুঝে এবং সেই অনুসারে চলে আমরা শরীরকে সুস্থ রাখি। ঠিক তদ্রুপ সূক্ষ্মতর

স্তরে যে নিয়ম আছে তাকে জেনে বুঝে এবং পালন করে আমরা আন্তরিক সুখ-শান্তি আয়ত্ত করতে পারি।

রোগের কারণ না জানলে তার প্রতিকার করাও অসম্ভব। হয়ত এমন একটা জটিল রোগের কথা বলে দিলেন যার সঙ্গে আসল রোগের কোন দূরবর্তী সম্বন্ধও নেই। এই অজ্ঞানতাই আমাদের রোগমুক্ত হতে দেয় না। রোগের যথার্থ কারণ জানা গেলে এবং সেই কারণকে নিবারিত করার প্রয়াসে লেগে গেলে রোগমুক্ত হওয়ার পথে কোন সংশয় থাকে কি?

যখন মানবীয় জ্ঞান এবং প্রতিভা নিজ শৈশব অবস্থাতে ছিল, তখন বিস্ময়-বিমূঢ় মানব প্রকৃতির বিভিন্ন রূপের রহস্য অবাক্ হয়ে দেখতো। প্রকৃতির সৌম্য শান্ত স্বরূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে যেতো, আর প্রচণ্ড রুদ্র রূপ দেখে ভয়ভীত হয়ে যেতো। যথার্থ কারণ না জানায় সেই অবস্থাতে ভয়ভীত মানব মনে করল—কোন অদৃশ্য দেবতার প্রকোপে প্রকৃতির ধ্বংসলীলা চলছে। এবং নিজের সুরক্ষার জন্য সেই অদৃশ্য দেবতাকে প্রসন্ন করার চেষ্টায় মেতে উঠলো, তাঁর প্রশংসায় গীত গাইল, পূজা-অর্চনা কর'ল, শুধু অন্ন-বলি নয়, নিরীহ-নিরপরাধ পশু এবং মানুষদেরও বলিদান করে ধরিত্রীকে রক্ত-রঞ্জিত কর'ল। আসল কারণই যখন জানলো না, রোগের প্রতিকার কী করে হবে? যখন মানুষ ক্রমশঃ এই সকল অন্ধবিশ্বাসকে অবহেলা করে সত্যের খোঁজ করল, তখন নিজের শ্রমের সমুচিত ফলও পেল। তারা প্রকৃতির যথার্থ সত্যের রহস্য খুঁজে বের কর'ল। প্লেগ, কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি মহামারীর যথার্থ কারণ আবিষ্কার করল। মেধাবী মানব এই ব্যাধিগুলোকে নির্মূল করার জন্য সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করল। দুর্ভিক্ষ, অজন্মা এবং বন্যার তাণ্ডবলীলা দেখে অসহায়ের মত হাত জোড় করে বসে না থেকে নিজেদের বুদ্ধি এবং পুরুষার্থকে কাজে লাগালো। নদীতে বাঁধ দিল। সত্যসন্ধানী এই মানব-মনীষা এইভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অন্ধবিশ্বাসের মূল উৎপাটিত করে জাতির সুখ-সমৃদ্ধি সাধনের কাজে লেগে গেল। মানবের এই সত্যানুসন্ধানের অভিযান বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। সে আজ অন্তরীক্ষকে মাপার জন্যও নিজের বামন কদম এগিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু, এই বাহ্যিক অন্বেষণ অপেক্ষা অধিক আবশ্যক এবং গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে নিজের আন্তরিক অন্তরীক্ষের অন্বেষণ, নিজের সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ রক্ষাকারী প্রবৃত্তির সত্যকার খোঁজ অর্থাৎ সেই সকল সত্যের অন্বেষণ যার দ্বারা আমরা দুঃখ-সন্তপ্ত হই এবং যাদের দ্বারা আমরা আবার দুঃখমুক্ত হই। এই সত্যগুলোকে না জানার ফলেই আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এত দুঃখকষ্টের কারণ স্বরূপ আমরা নানা দেব-দেবীর এবং ঈশ্বরের রোষের কথা ভেবেই মনে করি এঁদের তুষ্ট করতে পারলেই আমাদের দুঃখমুক্তি ঘটবে। এবং এইজন্যই যখনই কোন ছোট বা বড় দুঃখের সম্মুখীন হই, তখনই আমরা অবোধ এবং ভয়ভীত মানসিক অবস্থায় এঁদের নামে মানত করি, এঁদের উদ্দেশ্যে পূজো দিই। এঁদের যে সকল

পার্থিব (এবং মনুষ্যসৃষ্ট) দেবালয় আছে সেখানে তীর্থ করতে যাই এবং এঁদের অতিশয়োক্তিপূর্ণ প্রশংসাসূচক স্তবগুলো বারবার পাঠ করি। এই সকল মনঃকল্পিত বিধাতাদের প্রসন্ন করার জন্য অগণিত কর্মকাণ্ডের সৃজন এবং পালন করি।

কিন্তু মানবজাতির মধ্যে এমন প্রবুদ্ধ শ্রেণীও আছেন যাঁরা আন্তরিক সত্যের সন্ধানে নিজেদের নিযুক্ত করেছেন। যুগে যুগে অনেক ঋষি, মুনি, সন্ত, জ্ঞানী, বুদ্ধ, জিন হয়েছেন যাঁরা অন্তরের অন্তরীক্ষকে খোঁজ করে করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, আমাদের দুঃখসমূহের মূল কারণ এবং সেগুলোকে উৎপাটিত করার উপায় আমাদের ভেতরেই আছে, আমাদের বাইরে নয়। তাঁরা দেখেছেন যে, মানুষের চিত্তপ্রবাহে যখন যখন ক্রোধ, ঈর্ষ্যা, ভয়, বাসনা, মাৎসর্য প্রভৃতি বিকারসমূহের বিকৃতি প্রতিফলিত হয় তখন আমরা দুঃখ-সন্তপ্ত হয়ে উঠি এবং যদি এ সকল বিকার দূরীভূত হয়, তাহলে দুঃখ থেকে বিমুক্ত হই। তাঁরা এটাও অনুসন্ধান করেছেন—আচ্ছা, এই বিকারই বা কেন উৎপন্ন হয়? উত্তরও তাঁরা পেয়েছেন যে সমস্ত বিকারের জননী হচ্ছে তৃষ্ণা—প্রিয়কে পাবার জন্য তৃষ্ণা, অপ্রিয়কে দূর করার তৃষ্ণা। আমাদের ভেতরে ভেতরে যখন প্রিয়-সুখদ সংবেদনা উৎপন্ন হয় তখন রাগ-রূপী তৃষ্ণা জাগে, আবার যখন অপ্রিয়-দুঃখদ সংবেদনা উৎপন্ন হয়—তখন দ্বেষরূপী তৃষ্ণা জাগে। আরও অনুসন্ধান চললো। তাঁরা ভাবলেন—আচ্ছা, প্রিয়-অপ্রিয়, সুখদ-দুঃখদ সংবেদনা কেন উৎপন্ন হয়? তাঁরা এর উত্তরও পেয়েছেন—যখন চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ এবং মন—এই ছয়টি ইন্দ্রিয়ের সহিত এদের নিজ নিজ বিষয় রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ এবং চিন্তনের সংস্পর্শ-সংঘাত হয়, তখনই ভেতরে ভেতরে শরীর এবং চিত্তস্কন্ধে বিভিন্ন প্রকার অগণিত সূক্ষ্ম তরঙ্গ উৎপন্ন হয় এবং নিজেদের পূর্ব পূর্ব সংস্কার এবং অনুভূতি সমূহের আধারে আমরা সেগুলোকে প্রিয় বা অপ্রিয় সংজ্ঞা দিয়ে থাকি। তাঁরা আরও দেখেছেন যে ঐ সকল ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে নিজ নিজ বিষয়ের সংস্পর্শ না হলেও শরীর এবং চেতনার স্তরে যতদিন আমরা জীবিত থাকি ততদিন প্রতিমুহূর্তে এই স্পর্শ-সংবেদনা সমূহ উৎপন্ন হতেই থাকে এবং এগুলোকে প্রিয় বা অপ্রিয় মনে করে আমরা রাগ অথবা দ্বেষ উৎপাদন করে থাকি। তাঁরা আরও দেখেছেন যে সমস্ত প্রপঞ্চই অন্তর্মনের সেই স্তরে চলতে থাকে যে স্তরে আমাদের হুঁশই থাকে না অর্থাৎ আমরা বুঝতেই পারি না কখন স্পর্শ হয়েছে এবং পরিণাম স্বরূপ কখন সংবেদনা জেগেছে এবং তারই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ কখন আমরা রাগ-দ্বেষের স্রোতে ডুবে গেছি! কখন মানসিক উত্তেজনা আমাদের ছেয়ে ফেলেছে এবং দুঃখ পুঞ্জীভূত হতে সুরু করেছে! তাঁরা উপলব্ধি করেছেন যে, উপরে উপরে তথাকথিত হুঁশ থাকলেও ভেতরে ভেতরে আসলে চরম বেহুঁশ, অজ্ঞান, অবিদ্যা এবং মোহের বশে আমরা এই চিত্তপ্রবাহে প্রতিমুহূর্তে অনবরত রাগ-দ্বেষের কলুষ প্রবাহিত করতে থাকি—যেমন গলিত ক্ষত থেকে অনবরত পূঁজ-প্রবাহ বইতে থাকে। ফলে

আমরা সর্বদা দুঃখ-মগ্নই থাকি।

ঐ সকল মহাপুরুষদের অন্বেষণ চলতেই থাকে। তাঁরা দেখলেন যে, যে যে মুহূর্তে ব্যক্তি অন্তর্মনের গভীরতম স্তর পর্যন্ত জাগ্রত থাকে, অপ্রমত্ত থাকে, অজ্ঞান-অবিদ্যা-মোহ থেকে মুক্ত থাকে, এই অনিত্য-প্রবাহকে নির্লিপ্ত অনাসক্তভাবে দেখতে থাকে—সেই সেই মুহূর্তে চিত্তপ্রবাহে নতুন নতুন রাগ বা দ্বেষ উৎপন্ন হয় না। পরিণামস্বরূপ পুরাণো আস্রব (তৃষ্ণা) ক্ষীণ হয়। পূর্বসঞ্চিত কলুষ বিনষ্ট হয়। তাঁরা দেখেছেন যে বারে বারে এই সমতাময়ী জাগরুকতার অভ্যাসের দ্বারা চিত্তপ্রবাহ বিশুদ্ধ হয় এবং যতটা বিশুদ্ধ হয় ততটাই স্বতঃই সদ্‌গুণসম্পন্ন হয়। যখন একেবারে বিশুদ্ধ হয়, তখন সর্বথা সদ্‌গুণসম্পন্ন হয়।

এইভাবে নিজ নিজ অনুভূতি ও উপলব্ধির সাহায্যে সেই সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণ দেখেছেন রোগের মূলীভূত কারণ এবং রোগের নিবারণের উপায় কি? প্রকৃতি নিজে সারা রাজ্য ও রহস্য এঁদের কাছে খুলে দিয়েছেন। তাঁরা দেখেছেন যে সত্যসন্ধানের এই প্রতিক্রিয়াতে তাঁরা নিজেদের চিত্তধারাকে আস্রবসমূহ এবং কলুষসমূহ থেকে মুক্ত করতে পেরেছেন। তাঁরা জেনেছেন যে, যে যে ব্যক্তি এই অন্তর্নিরীক্ষণ ও আত্মদর্শনের প্রতিক্রিয়াকে আয়ত্ত করেছেন, সেই সেই ব্যক্তি নির্মলচিত্ত হয়ে দুঃখ-বিমুক্ত হয়েছেন । সত্যসন্ধানের এই প্রত্যক্ষ লাভ মানব জাতির অনেক বড় উপলব্ধি।

কখনও কখনও এই প্রশ্ন জাগে যে, যেমন বাহ্য ভৌতিক জগতের বৈজ্ঞানিকগণ যে গবেষণা করেছেন তার ফলভোগ করার জন্য আমরা তাঁদের কৃত গবেষণাকে অনুসরণ না করে সোজাসুজি তাঁরা যে আবিষ্কার করেছেন তারই ফল ভোগ করি, তদ্রুপ এই আন্তরিক চৈতসিক জগতের গবেষণালব্ধ ফলের ভাগীদার আমরা হতে পারবো না কেন? আমাদের উচিত মহাপুরুষেরা যে সত্যের অনুসন্ধান করেছেন তাকে মেনে নেওয়া। তাতে শ্রদ্ধা উৎপন্ন করা। ব্যস্, কাজ হয়ে গেল। আমাদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি কেন এই সত্যসন্ধানের প্রতিক্রিয়াতে স্বয়ং লেগে পড়বে? কেন ধর্ম-দর্শনের অভ্যাস স্বয়ং করবে? উত্তর হচ্ছে এই যে, এই সন্ধান প্রক্রিয়াই তো তাঁদের গবেষণার বিষয় ছিল। এটাই তো আমাদের রোগের ঔষধ। যতদিন পর্যন্ত না কেউ স্বয়ং আত্মনিরীক্ষণ করবে না ততদিন সে দুঃখ-মুক্ত হতে পারবে না। নিজের চিত্তবিকারসমূহকে নিজেই উপলব্ধি করে ওদের মূলোৎপাটন করা সম্ভব। এটাই তো ঔষধ যাকে সেবন করতেই হবে। যেমন কোন চিকিৎসাশাস্ত্রের বৈজ্ঞানিক গবেষণা করে দেখেছেন যে ম্যালেরিয়া রোগের অমুক কারণ এবং তার চিকিৎসার ঔষধ হচ্ছে কুইনাইন। এখন কুইনাইন যতই গুণকারী হোক না কেন ম্যালেরিয়া রোগী স্বয়ং সে কুইনাইন না খেলে সে রোগমুক্ত হতে পারবে কি? তদ্রুপ নানাভাবে নানাপথে গবেষণা করে এই শ্রেয়ার্থী সাধকগণ ধর্মদর্শনের ঔষধ আবিষ্কার করেছেন—যতই তিক্ত ঔষধ হোক এর সেবন তো অনিবার্য। সে সকল শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত মহাপুরুষগণের তো এটা

মহা কৃপা যে তাঁরা রাস্তা বের করে দিয়েছেন। গন্তব্যস্থলে যেতে হলে রাস্তা দিয়ে আমাদেরই চলতে হবে। কেউ নিজের কাঁধে চাপিয়ে কাউকে গন্তব্যস্থলে পৌঁছিয়ে দেবে না। 'নিজের মুক্তি নিজেরই হাতে' এই মহাসত্যকে স্বীকার করার অর্থ অহংকারী হওয়া নয়, বরং বিনীতভাবে নিজের জিম্মাদারিকে স্বীকার করা।

সাধকগণ! আমি নিজের এবং আমার পরিচিত হাজার হাজার সাধকগণের অনুভূতিকে ভিত্তি করে বলছি যে, এই প্রক্রিয়ার চর্চাপথে কোন অলৌকিক চমৎকারিত্ব নেই। যেটা উপলব্ধ হয় সেটা স্বয়ং নিজের কঠোর পরিশ্রমের দ্বারাই হয়ে থাকে। মনরূপ বস্ত্র জাগতিক লোভ-দ্বেষ-মোহে আচ্ছন্ন ও কলুষিত। আমাদের সৌভাগ্য যে এই উত্তম বিধিকে আমরা সাবান স্বরূপ পেয়েছি। আমরা এই সাবান যতটা প্রয়োগ করবো, ততটাই কাপড়ের (মনের) ময়লা দূর হবে, বেশী নয়। যতটা ময়লা থেকে যাবে ততটাই দুঃখ ভোগ করতে হবে। কোন কাজ করবো না অথবা একটু করে করবো, অথচ চাইবো সব ময়লা ধুয়ে যাক—এরকম কোন জাদু এখানে নেই। বস্তুতঃ এটা তো সারা জীবনের কাজ। সারা জীবন নিজেই নিজের প্রতি সজাগ সচেতন থাকতে হবে। অপ্রমত্ত থাকতে হবে। এটা সত্য কথা যে, পথটা খুবই দুর্গম। কিন্তু অন্য কোন রাস্তাও তো নেই!

কিন্তু আমাদের ভুলবশতঃ আমরা এমন এক রাস্তা খুঁজি যার সাহায্য আমরা কোন পরিশ্রম না করেও সাফল্য লাভ করতে পারি। এই অবস্থাতে আমরা আবার কল্পনা জগতের আশ্রয়ে চলে যাই। এতজন মনীষী যে পরম সত্যের সন্ধান পেয়েছেন—তাতে আমরা অন্তত এটুকু জেনেছি যে আমাদের দুঃখের কারণ কোন দেব-দেবী বা পরমেশ্বর নয়, আমাদেরই সঞ্চিত কর্ম-সংস্কার। কিন্তু তথাপি আশা করি যে আমরা হাজার হাজার কুকর্ম করলেও কোন একজন সর্বশক্তিমান করুণাসাগর অদৃশ্য শক্তিকে কোন প্রকারে প্রসন্ন করতে পারলে আমাদের সব দুঃখ চলে যাবে। এই আশাতে উৎফুল্ল হয়ে সেই অদৃশ্য শক্তির উদ্দেশ্যে পূজা-নৈবেদ্য নিবেদন করতে থাকি। আমরা বুঝতে পারিনা যে কী আমরা করছি। অন্ধভক্তির ভাবাবেশে আমরা যে ভগবানের সৃষ্টি করেছি সেই বেচারাকেই কিভাবে মৃত্তিকা-লিপ্ত করতে থাকি। এই ভগবান কিরকম যিনি পূজো-নৈবেদ্য পেলে প্রসন্ন হন, অতিশয়োক্তিপূর্ণ প্রশংসা-প্রশস্তিতে ফলে ফুলে একেবারে ঢোল হয়ে যান, 'জী হুজুর'কারী তোষামোদী লোকের উপর কৃপাদৃষ্টি রাখেন, পূজা-ভেট প্রদানকারীদের উপর মোহর-বর্ষণ করেন, নিজের প্রশংসাকারীর উপর প্রসন্ন হয়ে তার কাল রংকেও সাদা করে দেন, প্রবঞ্চক অপরাধীকেও নিরপরাধ মনে করেন! এই 'অহম্ এর পুতুল' এমনই যে যদি কেউ ভুলেও তাঁর নাম নিয়ে ফেলে তিনি তক্ষুণি তাকে উদ্ধার করেন। নিজের নামে তাঁর (ঐ ভগবানের) এমনই আসক্তি। আর এমনই আসক্তি তাঁর নিজের সম্প্রদায়ের প্রতি। যিনি যে সম্প্রদায়ের ভগবান তিনি সেই সেই সম্প্রদায়ের ব্যক্তির পক্ষ অবলম্বন করেন। এভাবে আমরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ভগবান সৃষ্টি করেছি।

তা ছাড়া, কোন সীমা আছে আমাদের এই পাগলামির! বাস্তবিকই কি এই বিশাল বিশ্বের ব্যবস্থা এমন কোন ঈশ্বর বা ঈশ্বরকুলের হাতে আছে যিনি বা যাঁরা পক্ষপাতী, দাম্ভিক, নিরংকুশ এবং সমস্ত নিয়ম-কানুন, ধর্ম-বিধানকে ভেঙে দিয়ে যথেচ্ছাচারী হবেন? দুর্গুণই দুর্গুণের ভাণ্ডার নয় কি।

যদি মানতেই হয়, তাহলে এরূপ দুর্গুণসম্পদ দেবতার পরিবর্তে কোন সদ্‌গুণসম্পন্ন দেবতাকেই মানা উচিত। তাহলে তাঁর সেই সকল সদ্‌গুণ চিন্তা করে, তার থেকে প্রেরণা পেয়ে ভক্ত স্বয়ং সর্বগুণসম্পন্ন হওয়ার কাজে লেগে যেতে পারে। এতে তো কল্যাণই সাধিত হয়! কিন্তু নিজের পাগলামিতে আমরা নিজেদেরই অমঙ্গল সাধন করছি। চিত্তবিশুদ্ধির দ্বারাই দুঃখমুক্তি হয়—এই বিধানকে স্বীকার করেও চিত্ত বিশুদ্ধ হোক বা না হোক এই বিধানকে ছেড়ে আমরা কোন নিরংকুশ বিধায়ককে স্তুতি প্রশংসাদির দ্বারা প্রসন্ন করার পাগলামিতে মেতে গেছি।

ধর্মদর্শনের অভ্যাস আমাদের এই ভ্রান্তি থেকে বাইরে নিয়ে আসে। দুঃখের কারণ হচ্ছে চিত্তেরই দূষণ এবং এই দূষণ থেকে চিত্ত বিমুক্ত হওয়াই দুঃখবিমুক্তি। প্রকৃতির এই নিয়ম-বিধান যতটা স্পষ্ট হবে ততটা চিত্তবিশুদ্ধিকেই একমাত্র লক্ষ্য মনে করে আমরা ধর্মপথে আরূঢ় হতে পারবো। তখন বিধান পালনই তো আমাদের কাছে মুখ্য হয়ে দাঁড়াবে। আর সবই গৌণ হয়ে যাবে। তখন এই বিধানই হবে বিধায়ক, নিয়মই হবে নিয়ামক, সত্যই হবে নারায়ণ, ধর্মই হবে ঈশ্বর। বিধান, নিয়ম, সত্য ধর্মকে বাদ দিয়ে তদতিরিক্ত কোন নারায়ণকে প্রসন্ন করার কথাও মনে স্থান পাবে না। ধর্ম ছুটে গেলে অমঙ্গল থেকে অমঙ্গল এবং ধর্ম ধারণ করলে মঙ্গল থেকে মঙ্গলে মানুষ উন্নীত হবে।

সত্যকেই ঈশ্বর মনে করে তার প্রতি সবিবেক শ্রদ্ধা রেখে যখন আমরা ধর্মদর্শনের অভ্যাস করি, তাহলে বাস্তবিকই যতটা ধর্মদর্শন অর্থাৎ সত্যদর্শন হয় ততটাই আমরা দুঃখবিমুক্ত হবো। ঐ অবস্থাতে অনন্ত প্রকৃতির সূক্ষ্মতর সত্যগুলোর সাথে আমরা একাত্ম হয়ে যেতে পারবো এবং প্রকৃতির এই সত্য নিজের নিয়মের রজ্জুতে বদ্ধ হওয়াতেই সেটা নিজেই আমাদের রক্ষা করে। ধারণ করলে ধর্মও স্বতঃই আমাদের রক্ষা করে। এইজন্য কাউকে খোশামোদ তোষামোদ করতে হয় না। এটাই ধর্মের-চিরন্তন নিয়ম। যখন আমাদের মন দুর্গুণে পরিপূর্ণ হয় এবং দূষিত মনোবৃত্তিসমূহের তরঙ্গ উৎপন্ন করে, তখন সমস্ত বিশ্বে ব্যাপ্ত দূষিত তরঙ্গসমূহের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আমরা দুর্গুণের এবং দুঃখের মাত্রা বাড়াতে থাকি। ঠিক তদ্রুপ যখন আমাদের মন দুর্গুণ থেকে মুক্ত হয়ে নির্মল হয়, সদ্‌গুণে পরিপূর্ণ হয়, সদ্‌বৃত্তিসমূহের তরঙ্গ সৃষ্টি করতে সুরু করে, তখন অনন্ত বিশ্বে পরিব্যাপ্ত দৃশ্য-অদৃশ্য প্রাণিজগতের, সাত্ত্বিক দেব-ব্রহ্ম কুলের শুদ্ধ ধর্মময়ী সাত্ত্বিক তরঙ্গকুল আমাদের কাছে এসে মিলিত হয়, আমাদের শক্তি প্রদান করে এবং আমাদের সুখবৃদ্ধি করে, সংরক্ষণ করে। এই নিয়ম এবং এই বিধানকে

প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করা যায়।

কোনও দেশের রাজ্যবিধান সেই দেশের ধর্ম—তদ্রুপ এই ধর্মবিধান সার্বদেশিক, সার্বজনীন, সার্বকালিক বিশ্ববিধান, বিশ্বধর্ম। যখন ঐ দেশের নাগরিক উক্ত রাজ্যবিধানানুসারে জীবন যাপন করে, বিধানকে ভাঙেনা তাহেল বিধায়কে ও কুপিত হওয়ার কোন ভয় থাকে না। দ্বিতীয়তঃ অযাচিতভাবেই তার যাবতীয় সুরক্ষার দায়িত্ব উক্ত রাজ্যেরই। কিন্তু যে নাগরিক সেই বিধানকে, রাজ্যের কানুনকে আস্তে আস্তে ভাঙে এবং বিধায়ক বা শাসককে তুষ্ট রাখার জন্য তাঁর খোশামোদ করে এবং তাঁর পূজা করতে থাকে—তাহলে সেই নাগরিক শুধু নিজের নয় বরং সমস্ত দেশ এবং সমাজের সুখ-শান্তি ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বিপজ্জনক বলে প্রমাণিত হয়। আর যে দেশের লোক রাজ্যের নিয়মকানুনকে সজাগ প্রহরীর মতো পালন করে সেই দেশে এবং সমাজে সুখ-শান্তি বিরাজ করবেই। এইভাবে এই বিশাল বিশ্বরাজ্যেও বিশ্ববিধানরূপী ধর্মপালন ব্যতীত সুখ-শান্তি লাভ করার অন্য কোন উপায় নেই।

সেইজন্য, শুধু নিজের সুখ-শান্তির জন্য নয়, সকলের সুখ-শান্তির জন্য ধর্ম ধারণ করুন। বিশ্ববিধানের অনুকূলে জীবন যাপন করুন এবং অটুট নিষ্ঠার সঙ্গে ধর্মদর্শনের অভ্যাসের দ্বারা চিত্তকে বিকারমুক্ত করার কাজে লেগে পড়ুন। এই অভ্যাসে যত বাধাই আসুক না কেন,—যতই অপ্রিয় লাগুক না কেন, নিজের চিরাচরিত সংস্কারসমূহের অনুকূল নাই বা হোক,—সেগুলোকে নির্মমভাবে দূর করে লক্ষ্যচ্যুত না হয়ে অনন্যভাবে চিত্তবিশুদ্ধির জন্য প্রযত্ন করুন, প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। অনন্তের কণায় কণায় সঞ্চিত মঙ্গলময় পরম সত্যের এটাই সর্বোত্তম বিধান।

১৯· বিদর্শন কেন?

মনে মৈত্রী করুণ রস, বাণী অমৃত পদ।
জনে জনে হিতের তরে, বলুন ধর্ম পদ।।

শান্তি এবং স্বস্তি কে না চায়,যেহেতু সমগ্র জগত অশান্তি এবং উত্তেজনায় ছেয়ে গেছে!শান্তিপূর্বক বাঁচা যদি আয়ত্ত হয়, তাহলে জীবন যাপনের উত্তম উপায়ও হাতের মুঠোর মধ্যে এসে যাবে। প্রকৃত ধর্ম বাস্তবিকই সুস্থ জীবন যাপনের উপায়—যার দ্বারা আমরা নিজেও শান্তিতে বাঁচতে পারি, অন্যদেরও সুখ-শান্তিতে বাঁচতে দিতে পারি। শুদ্ধ ধর্ম এটাই আমাদের শিক্ষা দেয়—এজন্য এই শুদ্ধ ধর্ম সার্বজনীন, সার্বকালিক এবং সার্বভৌমিক। সম্প্রদায় ধর্ম নয়। সম্প্রদায়কে ধর্ম বলে মানা প্রবঞ্চনা মাত্র।

জানতে চেষ্টা করুন, ধর্ম কিভাবে শান্তি দেয়?

প্রথমে জানা দরকার আমরা অশান্ত এবং চঞ্চল কেন হই? গভীরভাবে চিন্তা করলে অবশ্যই বোঝা যাবে যে যখন আমাদের মন বিকারসমূহের দ্বারা বিকৃত হয়ে ওঠে তখন তা অশান্ত হয়ে যায়। ক্রোধ, লোভ, ভয়, ঈর্ষ্যা বা এজাতীয় কোন কিছুর দ্বারা মন অশান্ত হতে পারে। তখন বিক্ষুব্ধ হয়ে আমরা ভারসাম্য বা সমতাকে হারিয়ে বসি। অতএব এর ঔষধ কি যাতে ক্রোধ, ঈর্ষ্যা, ভয় ইত্যাদি একেবারে না আসে, বা এলেও তার দ্বারা আমরা অশান্ত হয়ে না উঠি?

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে—এই বিকার কেন আসে? অধিকাংশক্ষেত্রে কোন অপ্রিয় ঘটনার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ আসে। তাহলে এটা কি সম্ভব যে সংসারে থাকব অথচ কোন অপ্রিয় ঘটনা ঘটবে না? কোন প্রতিকূল পরিস্থিতি উৎপন্ন হবে না? না, এটা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। জীবনে প্রিয়-অপ্রিয় উভয় প্রকার পরিস্থিতি আসবেই! তবে চেষ্টা করতে হবে যাতে বিষম পরিস্থিতি উৎপন্ন হলেও আমরা নিজের মনকে যেন শান্ত রাখতে পারি। চলার রাস্তায় কাঁটা-কাঁকর তো থাকবেই। উপায় হতে পারে যে আমরা জুতো পরে চলবো। রোদ বৃষ্টি থাকবেই—তবে ছাতা নিয়ে আমরা তা থেকে বাঁচতে পারি। তাহলে দেখা যাচ্ছে প্রতিকূল পরিস্থিতি থাকলেও আমরা নিজেদের রক্ষা করতে পারি।

তবে সুরক্ষা এতেই আছে যে, কেউ আমাকে গালি দিল, অপমান করলো—তাহলেও ক্ষুব্ধ না হয়ে আমি নির্বিকার থাকবো। এখানে একটা কথা বিচার্য যে—কোন ব্যক্তি অযোগ্য ব্যবহার করলে সেই দোষে আমার মধ্যে ক্ষোভ, বিকার কেন উৎপন্ন হয়, এর কারণ হচ্ছে আমাতে অর্থাৎ আমার সচেতন মনে সঞ্চিত অহংকার, আসক্তি, রাগ, দ্বেষ, মোহ আদির সঙ্গে উক্ত প্রতিকূল ঘটনার সংঘাত হলে ক্রোধ, দ্বেষ ইত্যাদি বিকার চেতন মনে প্রতিফলিত হয়। এইজন্য যে ব্যক্তির অন্তর্মন পরম শুদ্ধ, কোন প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও কোন বিকার বা অশান্তি তাঁর মধ্যে উৎপন্ন হতে পারে না।

তবে প্রশ্ন হচ্ছে যতদিন অন্তর্মন পরম শুদ্ধ না হয় ততদিন কি করণীয়?

মনে তো পূর্বসঞ্চিত সংস্কারমল আছেই—তার উপর এগুলোর সঙ্গে কোন অপ্রিয় ঘটনার সম্পর্ক হলেই নতুন নতুন বিকার সৃষ্টি হয়। এই অবস্থায় কি করণীয়?

একটা উপায় তো আছেই যে যখন মনে কোন বিকার উপস্থিত হয়, তাকে অন্যদিকে সরিয়ে দিতে হবে। অর্থাৎ অন্য কোন চিন্তা বা কাজে মনকে লাগাতে হবে—যাতে মন পূর্ব বস্তু থেকে পালিয়ে আসে। কিন্তু এই উপায়ও তো যথার্থ নয়! যে মনকে আমরা এক বিষয় থেকে সরিয়ে অন্য বিষয়ে নিয়ে আসছি—সে মনতো উপর উপরের চেতন মন। ভিতরের অচেতন বা অর্ধচেতন মন তো ভিতরে ভিতরে ক্ষুব্ধ হয়ে মুঞ্জ ঘাসের দড়ির মত পাকা পোক্ত হয়ে গাঁট বাঁধতে থাকে। ভবিষ্যতে কখনও ঐ গাঁট চেতন মনে এসে পড়লে অশান্তি ও চাঞ্চল্য আরও বেড়ে যায়। অতএব, পলায়নের দ্বারা সমস্যার সমাধান হবে না। রোগের যথাযথ ঔষধ প্রয়োগই বিধেয়।

এই সমস্যারই সমাধান খুঁজেছেন আনুমানিক আড়াই হাজার বছর আগে এই দেশের সন্তান ভগবান গৌতম বুদ্ধ এবং বহুজনহিতায় তা প্রচার করে সকলের পক্ষে সুলভ করেছেন। ভগবান বুদ্ধ নিজের অনুভূতির দ্বারা এটা জেনেছেন যে অপ্রিয় বিকার থেকে পালিয়ে না গিয়ে সেই বিকারকে একেবারে সামনে টেনে আনতে হবে। যে কারণে যে বিকার উৎপন্ন হচ্ছে সেই কারণটাকে ভাল করে দেখতে হবে। ক্রোধ উৎপন্ন হলে তা যেমন যেমন উৎপন্ন হচ্ছে ঠিক তেমন তেমন ভাবে দেখতে হবে। দেখেই চলুন। দেখবেন ক্রোধ আস্তে আস্তে শান্ত হতে আরম্ভ করেছে। এ ভাবে যে কোন বিকার উৎপন্ন হলে তাকে যথাযথভাবে দেখতে থাকলে সেই বিকার ক্রমশঃ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হতে থাকবে। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে এই যে— যখন সেই বিকার উৎপন্ন হয়, তখন আমাদের আর হুঁশ থাকে না। ক্রোধ উৎপন্ন হলে আমাদের হুঁশ থাকে না যে ক্রোধ উৎপন্ন হয়েছে। ক্রোধ অনর্থ ঘটানোর পরে হুঁশ হয় যে আমার মধ্যে ক্রোধ এসেছিল। তখন অনুশোচনা হয়—কারণ ক্রোধ যখন ছিল তখন হয়ত বেহুঁশ হয়ে কাউকে গালিগালাজ করেছি বা মারপিট করেছি। ক্রোধবশতঃ কৃতকর্মের জন্য পরে দিবারাত্র অনুশোচনা হয়। কিন্তু দেখা যায় এতৎসত্ত্বেও দ্বিতীয়বার অনুরূপ ঘটনা ঘটলেও আমরা বেহুঁশ হয়ে অনুরূপ অপ্রিয় কাজ করে ফেলি। পরে অনুশোচনা করে কোন লাভ হয় না। চোর যখন এল, তখন শুয়ে রইলাম। কিন্তু চোর ঘরের জিনিসপত্র চুরি করে পালাবার পর তাড়াতাড়ি তালা লাগিয়ে লাভ কি? সাপ পালিয়ে যাবার পর লাঠি পিটলে কি লাভ? মনে বিকার যখন জাগে তখন হুঁশ কে এনে দেবে? প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের সঙ্গে সচেতকরূপে কোন সহায়ক রাখতে পারে কি? এটা সম্ভব নয়। মনে করুন সহায়ক রাখা সম্ভব হল, কেউ নিজের জন্য একজন সহায়ক নিযুক্ত করলো—আর যথাসময়ে সহায়ক তাকে সচেতন করে দিল—'আপনার মধ্যে ক্রোধ আসছে, আপনি ক্রোধকে দেখুন।' কিন্তু মুশকিল হচ্ছে অমূর্ত ক্রোধকে

একজন কিভাবে দেখতে পাবে? যখন ক্রোধকে দেখার চেষ্টা করে তখন যে কারণে ক্রোধ উৎপন্ন হয়েছে সেই আলম্বন বারবার মনে উদিত হয় এবং অগ্নিতে ঘৃতাহুতির কাজ করে। ইহাই হচ্ছে উদ্দীপনা। বিকার থেকে মুক্তি কি ভাবে হবে! অতএব, এক বড় সমস্যা হচ্ছে এই যে, আলম্বন থেকে মুক্ত অমূর্ত বিকারকে সাক্ষীভাবের দ্বারা কিভাবে দেখা যাবে?

অতএব, আমাদের সামনে সমস্যা দুটি। এক, বিকার উৎপন্ন হবার সময় আমরা সচেতন কিভাবে হবো? দুই, সচেতন হয়ে গেলে অমূর্ত বিকারের নিরীক্ষণ সাক্ষীভাবের দ্বারা কিভাবে সম্ভব? ভগবান বুদ্ধ গভীরভাবে প্রকৃত সত্য সন্ধান করে দেখেছেন যে, কোনও কারণে মনে যখন কোন বিকার উৎপন্ন হয়, তখন একে তো শ্বাসের গতির মধ্যে অস্বাভাবিকতা আসে এবং দ্বিতীয়তঃ শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সূক্ষ্ম স্তরের উপর কোন না কোন প্রকারের জীব-রাসায়নিক ক্রিয়া হতে থাকে। যদি এই দুটোরই দেখার অভ্যাস করা হয়, তাহলে পরোক্ষভাবে নিজের মনের বিকারকে দেখার কাজ সুরু হয়ে যায় এবং বিকার স্বতঃই ক্ষীণ হয়ে হয়ে নির্মূল হতে সুরু করে। শ্বাসকে দেখার অভ্যাসকেই **আনাপান স্মৃতি** বলে এবং শরীরে উৎপত্তিশীল জীব-রাসায়নিক প্রতিক্রিয়াসমূহকে সাক্ষীভাবদ্বারা দেখার অভ্যাসকেই **বিদর্শন** বলে। উভয়ই একে অন্যের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এই উভয়েরই অভ্যাস ভাল করে হয়ে যাবার সুবিধে এই যে—শ্বাসের বদলে যাওয়া গতি এবং শরীরে উৎপন্ন কোন প্রকার জীব-রাসায়নিক প্রক্রিয়া আমাদের সচেতন করে দেবে যে চিত্তবীথিতে কোন এক বিকার উৎপন্ন হতে চলেছে। তখন শ্বাস এবং সূক্ষ্ম সংবেদনকে দেখতে থাকলে স্বভাবতই ঐ সময়ে উৎপন্ন বিকারের উপশম হোতে থাকবে। যে সময় আমরা শ্বাসের গ্রহণ ও ত্যাগকে সাক্ষীভাবের দ্বারা দেখি অথবা শরীরের জীব-রাসায়নিক বা বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় প্রতিক্রিয়াকে সাক্ষীভাবের দ্বারা দেখি, তখন বিকার-উৎপন্নকারী আলম্বনের সঙ্গে সহজেই সম্পর্ক ছেদ হয়ে যায়। এ রকম হওয়ার অর্থ বস্তুস্থিতি থেকে পলায়ন নহে। কারণ অন্তর্মন পর্যন্ত ঐ বিকার যে হালচাল উৎপন্ন করে দিয়েছে তাকেই যথাযথভাবে দেখা হয়ে থাকে। সতত অভ্যাস দ্বারা এভাবে নিজেকে নিজে দেখার এই উপায় যতটা পুষ্ট হয় ততটাই স্বভাবে দাঁড়িয়ে যায় এবং ধীরে ধীরে এই স্থিতি আসে যে কোন বিকার আর উৎপন্ন হয় না, উৎপন্ন হলেও বেশীক্ষণ স্থায়ী হতে পারে না, আর হলেও গভীর রেখাপাত করতে পারে না। বরং জল বা বায়ুর উপর কাঠের দ্বারা অঙ্কিত রেখার ন্যায় রেখাপাত করে যা সহজেই মিলিয়ে যায়। রেখা বা সংস্কার যত গভীর হবে ততই দুঃখদায়ক হবে এবং বন্ধনকারক হবে। যত শক্তিতে এবং যত বেশীক্ষণ কোন বিকারের প্রক্রিয়া চলে, অন্তর্মনে ততই ইহার গভীর রেখাপাত হয়। অতএব, কাজের কথা এই যে, বিকার যখনই উৎপন্ন হতে চলেছে, তখনই সাক্ষীভাবের দ্বারা পর্যবেক্ষণ করে এর শক্তি ক্ষীণ করে দেওয়া দরকার যাতে অধিক সময় বর্তমান থেকে

তা মনের বেশী গভীরে প্রবেশ করতে না পারে, আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গেই যেমন জল ঢালা হয়। পেট্রোল ঢেলে কেউ সেই আগুনকে বাড়িয়ে দেয় না। বিকার উৎপন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে দেখতে সুরু করা আগুন জ্বলে ওঠা মাত্র জল ঢেলে দেওয়ার মতই, আর যেই বস্তুকে অবলম্বন করে সেই বিকার উৎপন্ন হয়েছে বার বার তার কথা চিন্তা করা আগুনে পেট্রোল ঢেলে দেওয়ার মতো। যদি কেউ আমাকে অপমান করে, তাহলে বারবার তার কথা স্মরণ করলে দ্বেষ বেড়ে যায়—তখন তা থেকে বেরিয়ে আসা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

প্রকৃতির যে নিয়ম তাই সত্য, তাকেই অমরা ধর্ম বলি। প্রকৃতির এই নিয়ম যে যখন আমাদের মনে কোন বিকার জাগে, তখন আমরা অশান্ত হয়ে পড়ি। আর বিকার থেকে মুক্ত হলেই অশান্তি থেকে মুক্ত হই। সুখ শান্তি ভোগ করি। প্রকৃতির এই নিয়মকে জেনে বিকার থেকে মুক্ত হওয়ার কোন উপায় মহাপুরুষরা ধর্মের আকারে দুঃখার্তদের দিয়ে থাকেনা। কিন্তু নিজেদের পাগলপনার দ্বারা ঐ উপায়সমূহকে আমরা বাদ-বিবাদের বিষয় বানিয়ে সিদ্ধান্তের লড়াইয়ে পড়ে যাই এবং নতুন নতুন দার্শনিক বুদ্ধিবিলাসের দ্বারা পারস্পরিক বিদ্রোহ বাড়িয়ে নিজেদের এবং অপরের ক্ষতি করে থাকি।

বিদর্শন দার্শনিক সিদ্ধান্তের সংঘর্ষ নহে। প্রত্যেক ব্যক্তি জ্ঞানচক্ষু দ্বারা নিজে নিজেকে দেখবেন, নিজের শরীরে এবং মনে যা যা উৎপন্ন হচ্ছে, অনুভূত হচ্ছে তাই বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করবেন। নিজের মনের ভেতরে যখন বিকারের আগুন লাগে তখন নিভিয়ে দিতে হবে নিজেকেই। কি ভাবে? তাকে ভাল করে দেখে দেখে, ভাল করে জেনে জেনে। বিকার কেন উৎপন্ন হচ্ছে, মূল যদি ধরা পড়ে তাহলে নিজের চেষ্টার দ্বারাই সেই মূলকে উৎপাটিত করা যায়। এটাই হচ্ছে সম্যক্ দর্শন। এটাই হচ্ছে 'নিজেকে' দেখা। জ্ঞানচক্ষু দ্বারা নিরীক্ষণ। সম্যক্ অনুভূতির স্তরেই সত্যের যথার্থ দর্শন হয়ে থাকে। তাই, সজাগ থেকে যথাযথ সত্যকে দেখার অভ্যাসই হচ্ছে বিদর্শন। এই বিদর্শনকে বুদ্ধি-বিলাসের বিষয়ে পরিণত করে কোন লাভ নেই। পড়াশুনা, তাত্ত্বিক চর্চা-পরিচর্চা দ্বারা বৌদ্ধিক স্তরে হয়তঃ এর বিষয়কে বোঝা সম্ভব হতে পারে। তার দ্বারা কোন প্রেরণাও পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক লাভ হবে কেবল অভ্যাসের দ্বারা। অতএব নিজের মনকে বিকারসমূহের দ্বারা বিকৃত হতে না দিয়ে সর্বদা সচেতন থেকে 'নিজ'কে দেখতে থাকুন। বিনা অভ্যাসে এটা সম্ভব নয়। জন্মজন্মান্তর ধরে মনের পর্দায় যে সকল সংস্কার, বিকার স্তরে স্তরে পুঞ্জীভূত হয়েছে এবং নতুন নতুন বিকার উৎপন্ন করার যে স্বাভাবিক প্রবণতা সৃষ্ট হতে থাকে, তার থেকে মুক্তি পেতে হলে নিয়ত সাধনার অভ্যাস করতেই হবে, অন্য কোন পন্থা নেই। কেবল তত্ত্বের স্তরে তাকে জানা যথেষ্ট নয়। আর কেবল ১০ দিনের শিবিরে যোগদানও যথেষ্ট নয়। নিয়ত অভ্যাসের আবশ্যকতা আছে।

মাত্র ১০ দিনে অভ্যাসের দ্বারা কারও পক্ষে পারঙ্গম হওয়া সম্ভব নয়। ১০ দিনের কেবল ভবিষ্যতে যা করতে হবে তার বিধি জেনে নেওয়া সম্ভব হতে পারে। অভ্যাস কিন্তু সারাজীবন ধরে চালিয়ে যেতে হবে। অভ্যাস যতই বাড়বে, ধর্মজীবনে অবতরণ ততই গভীর হবে। জীবনে বাঁচার মতো বেঁচে থাকার বিধি এবং উপায় পুষ্ট হবে। আত্ম-সচেতনতা বাড়লে আচরণ শুদ্ধ হয়, চিত্ত নির্মল হয় এবং নির্বিকার হয়। নির্মল-নির্বিকার চিত্ত মৈত্রী, করুণা, মুদিতা এবং সমতার সদ্‌গুণসমূহের দ্বারা পূর্ণ হয়। সাধক স্বয়ং ত কৃতকৃত্য হন-ই সমাজের জন্যও তিনি সুখ-শান্তির কারণ হয়ে থাকেন।

আমাদের সৌভাগ্য যে, এই আত্ম-সমীক্ষা বা স্ব-নিরীক্ষণের অভ্যাস, বিদর্শন সাধনা-বিধি ব্রহ্মদেশে আড়াই হাজার বছর আগে থেকে আজ পর্যন্ত নিজের শুদ্ধ রূপে বর্তমান আছে। আমারও সৌভাগ্য যে এই বিধি কল্যাণকারী অবসর আমি পেয়েছি। শারীরিক ব্যাধির সাথে সাথে মানসিক বিকার এবং আসক্তির ব্যাধি থেকে মুক্তির রাস্তা খুঁজে পেয়েছি। বাস্তবিকই এক নতুন জীবন লাভ করেছি। ধর্মের মর্মজীবনে প্রবেশ করার এক মঙ্গলময় বিধি পেয়েছি। কয়েক বছর হল ভারতে ফিরে এসেছি। এই বিধি তো এই দেশেরই পুরণো নিধি! পবিত্র সম্পদ! কোনও কারণে এখানে মাটি-চাপা পড়ে ছিল। আমি তো ভগীরথের মতো এই হারানো ধর্মগঙ্গা ব্রহ্মদেশ থেকে এই দেশে পুনরায় নিয়ে এসেছি মাত্র—এজন্য আমি নিজেকে অত্যন্ত ভাগ্যবান বলে মনে করছি।

মনে পড়ে মানসিক বিকারসমূহের দ্বারা বিকৃত হয়ে আমি কত দুঃখ ভোগ করেছি। আর বিকারসমূহ থেকে মুক্তি পেয়ে কতই না দুঃখ মুক্ত হয়েছি। সুখলাভ করেছি। এইজন্য আমি চাই যে অধিক থেকে অধিক লোক যাঁরা নিজেদের মানসিক বিকারের দ্বারা বিকৃত এবং সেজন্য অহর্নিশ দুঃখ ভোগ করছেন, তাঁরা এই কল্যাণকারী বিধির দ্বারা বিকারমুক্ত হওয়ার উপায় শিখে নিন এবং দুঃখ-মুক্ত হয়ে সুখলাভ করুন!

মনে পড়ে যখন আমি বিকারগ্রস্ত হয়ে দুঃখ অনুভব করতাম, তখন নিজের দুঃখ শুধু নিজের মধ্যেই সীমিত রাখতাম না, অন্যদেরও দুঃখের ভাগী করতাম। আমার সঙ্গে সঙ্গে অন্যরাও কষ্ট পেতো। কারণ তখন অন্যদের দেবার মতো কিছুই ছিল না, কেবল দুঃখ ছাড়া। কাজেই এখন আমি চাই—এই কল্যাণকারী বিধির দ্বারা নিজে যত প্রকার বিকার থেকে মুক্ত হয়েছি এবং ফলতঃ যতটুকু সুখ-শান্তি পেয়েছি—তা জনসাধারণের কাছে বিতরণ করবো। এই বিতরণের দ্বারা সুখবৃদ্ধি হয়, মন প্রসন্ন হয়। শিবিরে আসার আগে সাধকগণ যে চেহারা নিয়ে আসেন এবং শিবিরের পরে বাড়ীতে ফেরার সময় তাঁদের চেহারার মধ্যে অদ্ভুত পরিবর্তন এবং উন্নতি দেখে আমি অপার আনন্দ লাভ করি। তাই আমি চাই, আরও বেশি লোক এই মঙ্গলকারী বিদর্শন ভাবনার দ্বারা উপকৃত হোক, সুখসমৃদ্ধ হোক। বহু বহু লোকের ভাল হোক, কল্যাণ হোক, মঙ্গল হোক, ইহাই আমার ধর্ম কামনা।

২০· আসুন, সুখ বন্টন করি

সারা জীবন ধরে আমরা তো মানুষদের কত দুঃখই দিয়েছি!

নিজের মূর্খতাবশতঃ যখনই মনে বিকার উৎপন্ন হয়েছে তখনই মন দৌর্মনস্যে (অসন্তোষে) ভরে গেছে; এবং শুধু মন দিয়েই নয় বাক্ এবং কায় দিয়েও এমন দুষ্কর্ম করেছি যাতে লোক দুঃখী, সন্ত্রস্ত এবং সন্তপ্ত হয়েছে! কত লোকের দুঃখের কারণ আমি হয়েছি! কতজনের ব্যাকুলতার কারণ হয়েছি! আমরা তো লোকদের শুধু দুঃখ, শুধু দুঃখই দিয়েছি!

এখন নিজের কোন অতীত পুণ্যের প্রভাবে এই সার্বজনীন সম্প্রদায়বিহীন অমূল্য এবং মঙ্গলকারী ধর্মরত্ন আমরা পেয়েছি। এই ধর্মসম্পদ আমাদের কতই না সম্পন্ন করে দিয়েছে! আমাদের কত বিপন্নতাকে দূর করে দিয়েছে! কত কত বিকার থেকে আজ আমরা মুক্ত হয়েছি! কত কত দুঃখ থেকে মুক্তি পেয়েছি! অপ্রিয় পরিস্থিতিতেও এখন হাসতে পারি! মনে মৈত্রী এবং করুণার ঢেউ নিয়তই প্রবাহিত হয়! জীবন ধন্য হয়েছে। এটাই তো সুখ! এটাই তো প্রকৃত সুখ!

আসুন, আমরা এই সুখ সকলের কাছে বিতরণ করি! এই সুখ সকলেই উপভোগ করুক। এই ধর্ম সকলেই লাভ করুক। জগতে কোন দুঃখী না থাকুক। সকলেই নিজ নিজ বিকারসমূহ থেকে মুক্ত হোক। মনের গ্রন্থি খুলে যাক, মালিন্য দূর হোক। সকলেই অবৈরী (শত্রুবিহীন) হোক, নির্ভয় হোক, নিরাময় হোক, নির্বিকার হোক, নিষ্পাপ হোক, নির্বাণোন্মুখ হোক।

অতএব আসুন, সদ্ধর্মের প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতা এবং অনন্য-নিষ্ঠার ভাব রেখে, সকল প্রাণিগণের প্রতি অসীম মঙ্গল মৈত্রী রেখে, প্রত্যেকের মঙ্গলের জন্য, নিজের মঙ্গলের জন্য—আমরা সবাই মিলে নিজেদের সম্মিলিত শক্তিকে কাজে লাগাই। আর এমন জীবন যাপন করি যার দ্বারা অধিক থেকে অধিকতর লোক সদ্ধর্মের দিকে আকৃষ্ট হয়! অধিক থেকে অধিকতর দুঃখী লোক সদ্ধর্ম-রস পান করতে পারে এবং দুঃখ-মুক্ত পারে! এইজন্য তাঁদের যতটা সেবা করা যায় যেন করি! যতটা সুবিধা দেওয়া যায় যেন দিই! যতটা সুযোগ দেওয়া যায় যেন দিই! ওঁদের যেন প্রকৃত অর্থে সুখী করতে পারি।

নিজের সুখ অন্যদের কাছে বিতরণ করার মধ্যেই আমাদের প্রকৃত সুখ নিহিত আছে—সকলের সুখ নিহিত আছে।

॥ ভবতু সব্বমঙ্গলং ॥

"Wherever the Buddha's teachings have flourished,

either in cities or countrysides,

people would gain inconceivable benefits.

The land and pepole would be enveloped in peace.

The sun and moon will shine clear and bright.

Wind and rain would appear accordingly,

and there will be no disasters.

Nations would be prosperous

and there would be no use for soldiers or weapons.

People would abide by morality and accord with laws.

They would be courteous and humble,

and everyone would be content without injustices.

There would be no thefts or violence.

The strong would not dominate the weak

and everyone would get their fair share."

~THE BUDDHA SPEAKS OF
THE INFINITE LIFE SUTRA OF
ADORNMENT, PURITY, EQUALITY
AND ENLIGHTENMENT OF
THE MAHAYANA SCHOOL~

Taking Refuge with a mind of Bodhichitta

In the Buddha, the Dharma and the Sangha,
I shall always take refuge
Until the attainment of full awakening.

Through the merit of practicing generosity
and other perfections,
May I swiftly accomplish Buddhahood,
And benefit of all sentient beings.

The Prayers of the Bodhisattvas

With a wish to awaken all beings,
I shall always go for refuge
To the Buddha, Dharma, and Sangha,
Until I attain full enlightenment.

Possessing compassion and wisdom,
Today, in the Buddha's presence,
I sincerely generate
the supreme mind of Bodhichitta
For the benefit of all sentient beings.

"As long as space endures,
As long as sentient beings dwell,
Until then, may I too remain
To dispel the miseries of all sentient beings."

GREAT VOW

BODHISATTVA EARTH-TREASURY
(BODHISATTVA KSITIGARBHA)

“ Unless Hells become empty,
I vow not to attain Buddhahood;
Till all have achieved the Ultimate Liberation,
I shall then consider my Enlightenment full !”

Bodhisattva Earth-Treasury is entrusted as the Caretaker of the World until Buddha Maitreya reincarnates on Earth in 5.7 billion years.

Reciting the Holy Name:
NAMO BODHISATTVA EARTH-TREASURY

Karma-erasing Mantra:
OM BA LA MO LING TO NING SVAHA

With bad advisors forever left behind,
From paths of evil he departs for eternity,
Soon to see the Buddha of Limitless Light
And perfect Samantabhadra's Supreme Vows.

The supreme and endless blessings
of Samantabhadra's deeds,
I now universally transfer.
May every living being, drowning and adrift,
Soon return to the Pure Land of Limitless Light!

⁕ The Vows of Samantabhadra ⁕

I vow that when my life approaches its end,
All obstructions will be swept away;
I will see Amitabha Buddha,
And be born in His Western Pure Land of
Ultimate Bliss and Peace.

When reborn in the Western Pure Land,
I will perfect and completely fulfill
Without exception these Great Vows,
To delight and benefit all beings.

⁕ The Vows of Samantabhadra Avatamsaka Sutra ⁕

DEDICATION OF MERIT

May the merit and virtue
accrued from this work
adorn Amitabha Buddha's Pure Land,
repay the four great kindnesses above,
and relieve the suffering of
those on the three paths below.
May those who see or hear of these efforts
generate Bodhi-mind,
spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
and finally be reborn together in
the Land of Ultimate Bliss.
Homage to Amita Buddha!

NAMO AMITABHA

南無阿彌陀佛

《孟加拉文：MANUSSATTA BIKASHE DHARMA,
MANUSYATVA VIKASE DHARMA》

財團法人佛陀教育基金會 印贈
台北市杭州南路一段五十五號十一樓
Printed and donated for free distribution by
The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation
11F., 55 Hang Chow South Road Sec 1, Taipei, Taiwan, R.O.C.
Tel: 886-2-23951198 , Fax: 886-2-23913415
Email: overseas@budaedu.org
Website: http://www.budaedu.org

This book is strictly for free distribution, it is not for sale.
এই বই সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিতরণের জন্য, বিক্রয়ের জন্য নহে।

Printed in Taiwan
3,000 copies; April 2011
BA019 - 9258